ইসলাম ও ব্যক্তি জীবন

ইউনিট ২

ভূমিকা

জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য আবশ্যকীয় পরিপূর্ণ নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। এ সকল নির্দেশনার মধ্যে প্রথমেই আসে ব্যক্তি জীবনের কথা। কারণ মানব সমাজ মূলত বিভিন্ন ব্যক্তিরই সমন্বিত রূপ। তাই ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে যদি ইসলামের আহকাম যথাবিধি অনুসরণ করা হয় তাহলে চূড়ান্তভাবে সমাজ জীবন সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে। ব্যক্তিজীবনের এ গুরুত্বের কারণে ইসলাম ব্যক্তিজীবনকে সুন্দর, দায়িত্বশীল ও সার্থক করে তোলার জন্য অবশ্য পালনীয় অনেকগুলো বিধান প্রদান করেছে। তাকওয়া, সত্যবাদিতা, সবর, যিকর, শোকর, তাওয়াক্কুল ও ইহসানের অনুশীলন ব্যক্তিজীবনকে সুন্দর করে। কর্তব্যপরায়ণতা, হালাল উপার্জন ও দেশপ্রেম ব্যক্তিজীবনকে সমাজ জীবনের জন্য উপকারি ও উপযোগী করে ভূমিকা রাখে। নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের অধিকার আদায় ব্যক্তিকে তোলার ব্যাপারে উদার মানবিক চেতনায় উদ্ভাসিত করে। এ ইউনিটে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানবো

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**এই ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সর্বোচ্চ সময় লাগবে ১৫ দিন**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ-

পাঠ- ১ : ইসলামের বুনিয়াদি আমলসমূহের ফযিলত
পাঠ- ২ : তাকওয়া
পাঠ- ৩ : সত্যবাদিতা (সিদক):
পাঠ- ৪ :সবর
পাঠ- ৫ : যিকর
পাঠ- ৬ : শোকর
পাঠ- ৭ : তাওয়াক্কুল
পাঠ- ৮ : ইহসান
পাঠ- ৯ : কর্তব্যপরায়নতা
পাঠ- ১০ : হালাল উপার্জনের গুরুত্ব
পাঠ- ১১ : হারাম উপার্জনের কুফল ও পরিণাম
পাঠ- ১২ : দেশপ্রেম
পাঠ- ১৩ : ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার
পাঠ- ১৪ : শিশুদের অধিকার
পাঠ- ১৫ : প্রতিবন্ধীদের অধিকার

পাঠ- ১ : ইসলামের বুনিয়াদি আমলসমূহের ফযিলত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ইসলামের বুনিয়াদি আমল কী কী তা বলতে পারবেন
- ইসলামের বুনিয়াদি আমলগুলোর সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- ইসলামের বুনিয়াদি আমলগুলোর ফযিলত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	বুনিয়াদি আমল, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ।

ইসলামের বুনিয়াদি আমল ৪টি। এগুলো হলো সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ। নিম্নে এ আমলগুলোর ফযিলত বর্ণনা করা হলো।

সালাত

'নামায' শব্দের আরবি পরিভাষা 'সালাত'। এটি যখন আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন এর অর্থ হয় রহমত, অনুগ্রহ বা দয়া। যখন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে সম্পর্কিত হয় তখন এর অর্থ হয় দরুদ। এর সাথে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক করা হলে এর অর্থ দাঁড়ায় দুআ, ক্ষমা প্রার্থনা, আবেদন বা চাওয়া। আর সালাত যখন ফেরেশতাদের সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন এর অর্থ হয় ইসতিগফার বা ক্ষমা, তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করা। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সূর্যাস্তের পর ও রাতে আল্লাহ নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ, রুকু, সিজদা, তাশাহুদ, কিয়াম ও শেষ বৈঠকের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য যে আমল করা ফরয করেছেন, তাকে সালাত বলে। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হল ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। সালাত অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ আমল। যেমন, কুরআন মাজীদে বহু আয়াতে আল্লাহ তাআলা সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَاَقِيْمُواالصَّلٰوةَ "তোমরা সালাত কায়িম কর।" (সূরা বাকারা ২ : ৪৩)

সালাত ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক বুনিয়াদ। একজন মানুষ মুসলিম নাকি অমুসলিম এর বাহ্যিক পরিচয় হলো সালাত। মুসলিম সালাত আদায় করে কিন্তু অমুসলিম সালাত আদায় করে না। মহানবি (স.) ইরশাদ করেন–"ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত।" (তিরমিযি)

সালাত ইমান ও ইসলামের নিদর্শন। কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে কিনা, ইমান এনেছে কিনা তা সালাতের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "প্রতিটি বস্তু বা বিষয়েরই নিদর্শন রয়েছে আর ইমানের নিদর্শন হলো সালাত।"

সালাতের মাধ্যমে প্রতিদিন পাঁচবার মুমিন আল্লাহ তাআলার দীদার লাভের অভিজ্ঞতায় ধন্য হয়। সে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে বাক্যালাপের সুযোগ পায় প্রিয়নবি (স.)এ জন্যই বলেছেন, "সালাত মুমিনগণের মি'রাজস্বরূপ।" (সুনানে ইবন মাযাহ)

সালাতে একজন মুসলিম সরাসরি নিজের সকল আবেগ ও আনুগত্যের প্রকাশ করতে পারে। নিজের সকল চাওয়া আল্লাহ তাআলার নিকট পেশ করতে পারে। সালাতের কারণে ব্যক্তি কখনও নিজেকে আল্লাহর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে পারে না।

মানুষের সকল বৈষয়িক কাজের মধ্যে তো বটেই এমনকি ইসলামের সকল ইবাদাতের মধ্যেও সালাত সর্বোত্তম। এ কারণেই এক সাহাবী (রা) যখন হযরত রাসূল (স.)কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম ইবাদত কোনটি ? তখন রাসূল (স.) বললেন– সময় মতো সালাত আদায় করা। (সহিহ বুখারি)

কিয়ামাতের দিন ভয়ানক অন্ধকারময় হবে। সে সময় সালাত আদায়কারী সফল হবে। সালাতের আলো তাঁকে পথ দেখাবে। রাসূল (স.) বলেন–

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সালাত সংরক্ষণ করে, তা তার জন্য কিয়ামতে নূর দলিল ও মুক্তির উপায় হবে।

কবূলকৃত সালাতের মাধ্যমে ব্যক্তি জান্নাত লাভ করবে। রাসূল (স.) বলেন, সালাত বেহেশতের চাবি। [মিশকাত] তাই যে ব্যক্তি সঠিকভাবে সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশের এই চাবি লাভ করবে। যে সালাত আদায় করবে না, জান্নাতের চাবি থেকে সে বঞ্চিত হবে। তাই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) এর ঘোষণা থেকে জানা যায়, যথাযথভাবে সালাত আদায়ে পাঁচটি বিশেষ পুরস্কার লাভ হয়। যেমন– জীবিকার কষ্ট দূর, কবরে সহজ প্রশ্ন, কবর আযাব মাফ, বিদ্যুৎ গতিতে পুলসিরাত পার ও জান্নাত লাভ। (সহীহ বুখারী)

যাকাত

যাকাত অর্থ পবিত্রকরণ, বৃদ্ধিকরণ, পরিশুদ্ধ করা প্রভৃতি। যাকাত দিলে হকদারের মাল পরিশোধের মাধ্যমে ব্যক্তির সম্পদ হালাল ও পবিত্র হয় এবং সামষ্টিক সম্পদ বণ্টন সম্পদের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয় অথবা যাকাত দিলে আল্লাহ যাকাতদাতার সম্পদে বরকত দেন। ফলে সম্পদ বেড়ে যায়। পরিভাষায় দরিদ্র মানুষের জন্য ধনী মানুষের সম্পদের যে অংশ আদায় করা আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন তাকে যাকাত বলে। কোনো মুসলমানের নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ অর্থাৎ ৭.৫ তোলা স্বর্ণ কিংবা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য অথবা এর সমপরিমাণ নগদ যদি ব্যক্তিমালিকানায় পূর্ণ এক বছর থাকে এবং তা যদি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় তাহলে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী এ সম্পদ থেকে ২.৫% হারে নির্দিষ্ট আটটি খাতে অর্থ দান করতে হয়। এ প্রক্রিয়াই যাকাত। যাকাত অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ আমল। যেমন, যাকাত অন্যতম ফরয ইবাদত। কুরআন মাজিদে প্রায় প্রতিস্থানে সালাতের পরপরই আল্লাহ তাআলা যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন, وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আর তোমরা যাকাত দিয়ে দাও। (সূরা বাকারা: ২: ৪৩)

যে পাঁচটি বুনিয়াদের উপর ইসলামের স্থিতি ও ভিত্তি, যাকাত তার অন্যতম। একে বাদ দিয়ে বা একে অবেহলা করে ইসলামের অনুশীলন অসম্ভব।

যাকাত মানুষের আত্মাকে সম্পদের অন্যায় মোহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে। যাকাত দিয়ে সে গর্ব বা প্রচার কিছুই করতে পারে না। যদি করে, তাহলে যাকাত আদায় হয় না বরং প্রদর্শনেচ্ছার কারণে সে আরো আযাবের যোগ্য হয়ে যায়। মানুষ আল্লাহকে ভালোবাসে কিনা, যাকাত তার একটি বলিষ্ঠ প্রমাণ। কারণ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ব্যতীত এভাবে কেউ সম্পদ দান করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّه

'আল্লাহ প্রেমে ধনসম্পদ দান করে।' (সূরা বাকারা ২ : ১৭৭)

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ-الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

'মুশরিকদের জন্য দুর্ভোগ, যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতের প্রতিও বিশ্বাস রাখে না।' (হা মীম আস–সাজদাহ ৪১ : ৬-৭)

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয়। এতে ব্যক্তি লোভ ও মোহের হাত থেকে রক্ষা পায় আর ব্যক্তির সম্পদ অন্যের হক থেকে মুক্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

'তাদের সম্পদ হতে সদকা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।' – (সূরা তাওবা ৯ : ১০৩)

যাকাত না দিলে আখিরাতে জাহান্নামের ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হবে। যাকাত আদায় করার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالَّذِيْنَ يُكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

'আর যারা সোনা ও রুপা জমা করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।' সূরা তাওবা ৯ : ৩৪)

সাওম

রোযা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ সাওম। এর অর্থ বিরত থাকা। রমযান মাসে সাওমের নিয়তে সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় যৌনকর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে। প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মুসলমানের ওপর সাওম পালন করা ফরয। এটি অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল। যেমন,

ফরয ইবাদত

সাওম পালন করা ফরয। আল্লাহ তাআলা সাধারণভাবে সকল মুসলমানের উপর এটি পালন করা ফরয করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা রাখা ফরয করা হল যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের আগের লোকদের উপর।" (সূরা বাকারা ২: ১৮৩)

ইসলাম যে পাঁচটি বুনিয়াদ বা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সাওম সেগুলোর অন্যতম। যে কারণে কোনো মুসলিম একে অস্বীকার করতে পারে না এবং একে অস্বীকার করে মুসলিম থাকা যায় না।

সাওমের মূল লক্ষ হল তাকওয়া অর্জন। তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই সাওম ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থ: যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সূরা বাকারা ২:১৮৩)

সাওমের মাধ্যমে তাই তাকওয়া অর্জন হয়। সাওমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। কারণ এতে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্য কম থাকে। ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সাওম পালন করে থাকে। এ মর্মে হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "সাওম শুধু আমার জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান প্রদান করব।" (বুখারি, মুসলিম)

সাওম পালনকারী আখিরাতে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ লাভের মহাসৌভাগ্য লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন–

"রোযাদারের জন্য দুটি খুশি ; একটি তার ইফতারের সময় আর অপরটি আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাতের সময়।" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

রোযা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও জৈবিক পাশবিক কামনা থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে। মহানবি (স.)বলেন, "সাওম ঢালস্বরূপ।" (মিশকাত)

সাওম পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ক্ষমা লাভ করেন। ব্যক্তির আগের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন– "যে ব্যক্তি ইমান ও আত্মবিশ্লেষণের সাথে রোযা রাখে তার পূর্বকৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়।" (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

সাওম ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। সঠিকভাবে সাওম পালন করলে আল্লাহ তাআলা সাওম পালনকারীকে জান্নাতের পুরস্কারে ভূষিত করবেন। হযরত নবি (স.) এ কারণেই বলেছেন, "রমযান ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত।" (মিশকাত)

হাশরের কল্পনাতীত রৌদ্রদগ্ধ দিনে সাওম পালনের জন্য আল্লাহ তাআলা রোযাদারদের আরশের ছায়া দান করবেন। নিঃসন্দেহে এটি হবে একটি বিরাট সফলতা।

হজ্জ

হজ্জ অর্থ ইচ্ছা বা অভিপ্রায় পোষণ করা, আগ্রহ ব্যক্ত করা। কোনো কাজ সম্পাদনের সৃদৃঢ় প্রত্যয় বা সিদ্ধান্ত পোষণ করা। পরিভাষায়, দৈহিক ও আর্থিক দিক দিয়ে সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর জীবনে মাত্র একবার যিলহজ মাসে, ইহরামের সাথে, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও আরাফাতে অবস্থানের যে নির্দেশ আল্লাহ তাআলা দান করেছেন তাকে হজ্ব বলে। হজ অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ একটি আমল। যেমন,

প্রতিজন সমর্থবান মুসলমানের উপর জীবনে একবার হজ্জ পালন করাকে আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন। কুরআনে এসেছে, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।' – (আলে ইমরান ৩: ৯৭)

ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের মধ্যে হজ একটি। একে বাদ দিলে বা উপেক্ষা করলে ইসলামের মূল কাঠামো বিনষ্ট হবে।

হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা পালন করা মুসলমান থাকার অন্যতম শর্ত। এ কারণেই রাসূল (স.)বলেছেন, "যাকে কোনো রোগ, কোনো প্রকৃত প্রয়োজন অথবা কোনো যালিম শাসক ঠেকিয়ে রাখে নি এরপরও যদি সে হজ না করে, তাহলে সে ইয়াহুদী হয়ে মৃত্যুবরণ করুক অথবা খ্রিস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করুক।" (মিশকাত)

হজ্জের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়। আল্লাহ তাআলা হজ্জপালনকারীকে ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাজ (সা.) বলেন- "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্জ করে এবং এ সময় কোন যৌন ক্রিয়া ও গুনাহের কাজ না করে তাহলে সে যেন সদ্যোজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে।" (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

হজ্জ এমন একটি বুনিয়াদ কেউ যদি এটি সঠিকভাবে আদায় করতে পারে এবং তা যদি আল্লাহর নিকট কবূল হয় তাহলে হজ্জ আদায়কারী জান্নাত লাভ করবে। প্রিয় নবি (স)বলেছেন– "মকবুল হজ্জের প্রতিদান বেহেশত ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

সারসংক্ষেপ

ইসলামের বুনিয়াদি আমলসমূহ কেবল ইবাদাত নয়। এগুলো মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে বহুবিধ মানবিকগুণে বিভূষিত করার একটি অনন্য ব্যবস্থাপনা। মুমিন ব্যক্তি যদি এ আমলসমূহ সঠিকভাবে সম্পন্ন করে তাহলে সে প্রকৃত মানুষ হিসেবে সমাজে বিশেষ স্থান লাভ করবে, আখিরাতেও অশেষ পুরস্কারে ভূষিত হবে। এ আমলগুলো বাদ দিয়ে বা এগুলোতে অবহেলা করে কারো পক্ষে প্রকৃত মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ, ইসলামের বুনিয়াদি আমলের ফজিলতের উপর একটি বক্তৃতা অনুষ্ঠান করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইসলামের বুনিয়াদি আমলগুলো কী কী?
ক) সালাত, যাকাত, সাওম ও কুরবানি
খ) সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ
গ) সালাত, সাওম, ইমান ও জিহাদ
ঘ) ইমান, জিহাদ, তাবলীগ ও দাওয়াহ

২। যাকাত অর্থ কী?
ক) পবিত্রতা ও বৃদ্ধি
খ) বিরত থাকা
গ) প্রার্থনা করা
ঘ) আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প

৩। কোন আমলের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে দেবেন?
ক) কুরবানির
খ) সালাতের
গ) মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের
ঘ) সাওমের

৪। হজ্জ ও উমরাহ পালনকারী কার মেহমান?
ক) আল্লাহর
খ) সৌদি বাদশাহর
গ) হজ্জ এজেন্সির
ঘ) হযরত ইব্রাহীম (আ)এর

সৃজনশীল প্রশ্ন

আহসান সাহেব ধনী লোক। তিনি মসজিদে গিয়ে নিয়মিত সালাত আদায় করেন। গত বছর হজ্জ করে এসেছেন। রমযান মাসে সমস্ত রোযা রাখেন। কিন্তু যাকাত দিতে আগ্রহী নয়। তিনি মনে করেন, আরবে গরিব লোক বেশি ছিল সম্ভবত তাই যাকাতের বিধান দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে এটি ফরয নয়।

ক) সালাত কাকে বলে?
খ) একজন মানুষ জীবনে কতবার হজ্জ করবে এবং কেন?
গ) আহসান সাহেবের বক্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি দিন।
ঘ) দরিদ্রতা নির্মূলে যাকাতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক, ৩. ঘ, ৪. ক ,

পাঠ- ২ : তাকওয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তাকওয়ার পরিচয় বলতে পারবেন
- তাকওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- তাকওয়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, আল্লাহভীতি, জান্নাত।

ইসলামে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল সুন্দর চরিত্র। আর সুন্দর চরিত্র অর্জনের বিষয়টি একান্তভাবে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তা হল তাকওয়া। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে তাকওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করে। এখানে তাকওয়ার পরিচয় এবং গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

তাকওয়ার পরিচয়

তাকওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা বা সতর্ক থাকা। আত্মশুদ্ধি, বেঁচে থাকা, আত্মরক্ষা, সংযত হওয়া, ভয় করা প্রভৃতি। তবে সাধারণভাবে তাকওয়া ব্যবহৃত হয় 'আল্লাহভীতি' অর্থে।

ইমাম গাযালি বলেন, "আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে যাবতীয় অসৎকর্ম বর্জন করে সৎকর্ম সম্পাদনই হলো তাকওয়া।"

সুফিগণ বলেন, "পরকালীন জীবনে ক্ষতিকর বিবেচিত হতে পারে এমন সবরকমের বস্তু ও বিষয় থেকে বিরত থাকাই তাকওয়া।"

মোটকথা, তাকওয়া হলো প্রথমত, শিরক থেকে বিরত থেকে স্থায়ী শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, গুনাহে লিপ্ত করে বা গুনাহের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে এমন কাজ থেকে বিরত থাকা এবং চূড়ান্তভাবে যে সকল বস্তু ও বিষয় মানুষকে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে গাফিল করে দেয়-তা বর্জন করা।

তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সৎকর্মের প্রেরণা

ইসলামি জীবনদর্শনে তাকওয়াই সব সদগুণের মূল। অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি থাকলেই মানুষ কেবল সৎকর্ম সম্পাদনে উৎসাহী হয়।

চরিত্র গঠন

মানুষের চরিত্র গঠন ও সুরক্ষায় তাকওয়া এক সুদৃঢ় দুর্গ স্বরূপ। যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় করে তার পক্ষে খারাপ কাজ করা সম্ভব নয়। তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ সম্ভব হয়।

আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভ

আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভ করতে হলে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাকওয়াবানদের ভালোবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ৩: ৭৬)

তাকওয়াবিহীন ইবাদত মূল্যহীন ও কবুলের অযোগ্য। আল্লাহ বলেন– "আল্লাহর কাছে পৌঁছে শুধু তোমাদের তাকওয়া।" (সূরা হাজ্জ ২২: ৩৭) কাজেই ইবাদতের মূল বিষয় হলো তাকওয়া।

তাকওয়া ছাড়া ইমান পূর্ণ হয় না। ইমানের পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন পরিপূর্ণ তাকওয়া। আল্লাহ বলেন– "আল্লাহকে ভয় কর। যেমন ভয় তাঁকে করা উচিত।" আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে যে বেশি তাকওয়াবান, সুনিশ্চিতভাবেই আল্লাহর নিকট সে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি।" (সূরা হুজুরাত ৪৯:১৩)
কাজেই তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের আসীনে সমাসীন হয়।

নৈতিক লাভ

তাকওয়া ব্যক্তিকে তার সকল দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক করে তোলে। তাকওয়া মানুষকে সুশীল, শোভন ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলে। যা তাকে সবার ভালোবাসার পাত্রে পরিণত করে।
তাকওয়াবান মানুষ অন্যায়, অবিচার, পাপাচারমুক্ত জীবনযাপন করে বলে তাদের সমন্বয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে।
তাকওয়া ব্যক্তিকে কর্তব্যে নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক করে তোলে বলে সমাজের উন্নতি সাধিত হয়।
তাকওয়া ব্যক্তিকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ বলেন- "তোমরা ন্যায়বিচার কর, এটি তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী।" (সূরা মায়িদা ৫:৮)
বস্তুত তাকওয়া হলো একটি মহৎ গুণ। মানুষ যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে বা ভাবনা চিন্তায় পাপাচারী হয়ে ওঠে, তখন তাকে অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তাকওয়া। এভাবে প্রতিজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত পবিত্রতা তার পরিবার ও সমাজকে ও পবিত্র করে তোলে।

জান্নাতলাভ

তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে মানুষের জান্নাত লাভের পথ সুগম হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى .فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوٰى

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এব প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে তার স্থান হবে জান্নাত।" (সূরা নাযিআত ৭৯: ৪০-৪১) সুতরাং তাকওয়া জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা দেয়।

সারসংক্ষেপ

তাকওয়া কেবল নেক আমল নয়, বরং অবশিষ্ট সকল নেক আমলের ভিত্তি। আল্লাহ তাআলার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম থেকে যে ভয় উৎসারিত হয় সে ভয়ই কেবল মানুষকে সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে, সকল ভালো কাজে নিয়োজিত রাখতে পারে। তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে এ সত্যই প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	সকল শিক্ষার্থী তাকওয়ার গুরুত্বের উপর কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি সহকারে এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। তাকওয়া অর্থ কী?
ক) আল্লাহ নির্ভরতা
খ) ধৈর্যশীলতা
গ) আল্লাহভীতি
ঘ) আল্লাহর স্মরণ

৩। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?
ক) দানশীল ব্যক্তি
খ) আলেম ব্যক্তি
গ) তাকওয়াবান ব্যক্তি
ঘ) দেশনেতা

৩। তাকওয়াবান ব্যক্তি অপরাধ থেকে কেন দূরে থাকেন?
ক) আল্লাহর ভয়ে
খ) পুলিশ বাহিনীর ভয়ে

গ) লোকলজ্জার কারণে ঘ) উত্তম চরিত্রের দাবিতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব আশরাফ একটি ঔষধ কোম্পনির মালিক। সে কখনো ভেজাল ঔষধ তৈরি করে না। একবার তার বন্ধু সুমন তার অফিসে এসে বললো বন্ধু! তুমি তো ঔষধে ভেজাল মিশিয়ে বেশি মুনাফা করতে পারো। তখন আশরাফ বললো ঔষধে ভেজাল মেশানো মারাত্মক অপরাধ। তখন সুমন বললো সে তো আর কেউ জানবে না। তখন আশরাফ বললো। কেউ না জানলেও মহান আল্লাহ তো জানবেন। আমি আল্লাহকে ভয় করি আমি কখনো ভেজাল ঔষধ তৈরি করবো না।

ক) তাকওয়া কাকে বলে?

খ) মানুষের জীবনে তাকওয়ার এতো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ কী?

গ) তাকওয়ার প্রভাবে কীভাবে আশরাফের মতো যুবকেরা নিজেদেরকে ভেজাল ঔষধ তৈরি থেকে রক্ষা করতে পারে?

ঘ) মুমিন জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তরমালা: ১. গ ২. গ ৩. ক

পাঠ- ৩ : সত্যবাদিতা (সিদক)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সত্যবাদিতার পরিচয় বলতে পারবেন
- সত্যবাদিতার গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা করতে পারবেন
- মিথ্যার কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

Key Words/মুখ্যশব্দ	সিদক, কিযব, তাকওয়া, সাদিক ও কাযিব।

পরিচয়

মানব চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো সিদ্ক বা সত্যবাদিতা। ইসলাম মানুষকে সৎ, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে আদর্শ সমাজ তৈরির জন্যে ব্যক্তির এ গুণটির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। ব্যক্তিগত জীবনে এর অনুশীলনে মানবসমাজ সুন্দর ও সমৃদ্ধ হয়।

'সিদক' আরবি পরিভাষা। অর্থ সত্য বা সত্যবাদিতা। সাধারণত সত্য কথা বলার গুণ বা অভ্যাসকে সিদক বলা হয়। সততা, সত্যপ্রিয়তা, সত্যকে গ্রহণ করার মানসিকতা বুঝাতেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যার মধ্যে সিদক বা সত্যবাদিতার গুণ পাওয়া যায় তাকে বলে সাদিক বা সত্যবাদী। পরম সত্যবাদী ব্যক্তিকে বলা হয় 'সিদ্দিক'। যেমন হযরত আবু বকর (রা) কে বলা হতো- আবু বকর সিদ্দিক বা সিদ্দিকে আকবর। সিদকের বিপরীত শব্দ হলো কিযব বা মিথ্যাবাদিতা।

পরিভাষায়, প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতাকে স্বীকার করা কিংবা ঘটনা যা ঘটেছে তার আসল বর্ণনা দেওয়াই সিদক। কোনো বিষয় বা ঘটনার কোন রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়া তার প্রকৃত অবস্থা ও চরিত্র প্রকাশ করা। এজন্যে ইসলামকে সিদক

বা সত্য বলা হয়। কেননা, আল্লাহর তাওহিদ, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রিসালাত এবং আখিরাত সম্পর্কে সে প্রকৃত ও অবিকৃত তথ্য পরিবেশন করে।

সিদকের উপকারিতা

সিদ্‌ক বা সত্যবাদিতার অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন–

আল্লাহর নির্দেশ পালন

সত্যবাদী বিবেকবিরোধী ও বাস্তবতাবিবর্জিত কথা বলা ও কাজ করা থেকে মুক্তিলাভ করে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-"সত্য মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে" (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ তাআলা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদক বা সত্যবাদিতার অনুশীলনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يٰٓ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বলো।" (সূরা আহযাব ৩৩: ৭০)

সামাজিক মর্যাদালাভ

সিদক মানুষকে সামাজিকভাবে সম্মানিত করে। যে সত্য কথা বলে বা সত্যের অনুশীলন করে সমাজের সকল লোক তাকে ভালবাসে ও বিশ্বাস করে। প্রিয়নবি (স.) বাল্যকাল থেকে সদা সত্য বলার জন্য সর্বজনীন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

পাপ থেকে সুরক্ষা

হাদিসে এসেছে-এক ব্যক্তি সব রকমের অন্যায় করত। মহানবি (স.) তাকে কেবল সত্য বলার নির্দেশ দেন। ফলে সে সকল পাপ প্রবণতা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়।

জান্নাতলাভ

সিদক এর মাধ্যমে ব্যক্তির জান্নাতলাভ নিশ্চিত হয়। মহানবি (স.) বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ

"তোমাদের সত্য কথা বলা উচিত। কেননা সত্য পুণ্যের পথে এবং পুণ্য জান্নাতের পথে পরিচালিত করে" (সহিহ মুসলিম)

কিযবের অপকারিতা

সিদকের বিপরীত গুণ হলো কিযব। তাই সিদকের যেমন উপকারিতা আছে, তেমনি আছে কিযবের অপকারিতা। যেমন– ইমানদরের বৈশিষ্ট্য হলো সত্য কথা বলা ও সত্য পথে চলা। আর কাফেরের বৈশিষ্ট্য হলো মিথ্যা কথা বলা ও অসৎ পথে চলা। মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

"মিথ্যা তারাই বলে, যারা আল্লাহর আয়াতে ইমান রাখে না।" (সূরা নাহ্‌ল ১৬: ১০৫) কাজেই কিযব হলো ইমানহীনতার সবচেয়ে বড় প্রকাশ।

কিযব একটি ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত কাজ। কিযবের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসুল (স)-এর ক্রোধ ও ঘৃণা লাভ হয়।

কিযব ব্যক্তিকে আকণ্ঠ পাপে নিমজ্জিত করে। মহানবি (স.) বলেন– "মিথ্যা সকল পাপের মূল বা জননী।"

কিযব ব্যক্তির পার্থিব ও পরকালীন জীবনে মহাবিপর্যয় ডেকে আনে। মহানবি (স.)বলেছেন, "মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।" মিথ্যাচার মানুষকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে। মিথ্যাবাদী যাবতীয় অন্যায় ও খারাপ কাজে লিপ্ত থাকে। রাসূল (স.) বলেন– "তোমাদের মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য। কেননা মিথ্যা পাপের পথে আর পাপ জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে।" (সহিহ্ মুসলিম)

মহানবি (স.)তিনটি প্রধান কবীরা গুনাহের কথা বলেছেন। মিথ্যা তার অন্যতম।

কিযব এক ভয়াবহ পাপাচার। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া শিরকের সমান গুনাহ বলে ঘোষনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.)বলেন– মিথ্যাসাক্ষ্য আল্লাহর সাথে শিরক সম অপরাধ। কথটি তিনি তিনবার বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ)

মুনাফিকীর পর্যায়ভুক্ত

রাসূলুল্লাহ (স.) মুনাফিকদের তিনটি পরিচিতি উল্লেখ করেছেন। যার প্রথমটি হলো মিথ্যা বলা। যেমন হাদিসে এসেছে-

أَيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُتُمِنَ خَانَ

"মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি, যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে; যখন ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে; যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, সে তা খেয়ানত করে।" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

ইবাদত কবুল হয় না

কিযবে অভ্যস্ত ব্যক্তির ইবাদত কবুল হয় না। মহানবি (স.) বলেন– "যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুসারে কাজ করা ত্যাগ করে না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।" (সহিহ্ বুখারি)

জাহান্নাম লাভ

প্রকৃতপক্ষে সিদক ও কিযব হলো মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরস্পরবিরোধী দুটি দিক। সিদক শ্রেষ্ঠতম মহৎ গুণ। এতে অভ্যস্ত ব্যক্তি পৃথিবী ও পরকালে সমাদৃত ও সফল। অপরদিকে কিযব সকল পাপের মূল। দুনিয়া ও আখিরাত জীবনের সকল পর্যায়ে এটি ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ডেকে আনে।

সারসংক্ষেপ

ইসলাম সত্য, ইসলামের অনুসারী হলে সে কারণে সত্যবাদিতা ও সত্যাচরণ আবশ্যক। সত্যবাদিতা ও ইমান কখনোই একীভূত হয় না। মিথ্যাচার মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভাবনীয় ক্ষতির শিকার হতে বাধ্য করে। এ কারণে ইমান আনয়নকারী, ইসলাম গ্রহণকারী সকলের প্রথম কর্তব্য মিথ্যাচারকে বর্জন করে সত্যবাদিতার অনুশীলন করা।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	কিযবের (মিথ্যাচারিতা) অপকারিতা গুলো শিক্ষার্থীগণ টিউটরিয়াল সেশনে পরস্পর আলোচনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। তাকওয়া হতে উৎসারিত গুণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ কোনটি?
ক) সত্যবাদিতা খ) স্বদেশপ্রেম গ) সৎসঙ্গ ঘ) পরোপকার

২। কোন কারণে আমলসমূহ সংশোধিত হয়ে যায়?
ক) শোকরে খ) সবরে গ) ইহসানে ঘ) সত্যবাদিতায়

৩। সত্যবাদিতা ও মিথ্যাচারের আরবি কী?
ক) সিদক ও সাদিক খ) কিযব ও কাযিব গ) সিদক ও কিযব ঘ) সবর ও সিদক

৪। মুনাফিকের ৩টি আলামত কী কী?
ক) ওয়াদা ভাঙা খ) আমানতের খিয়ানত করা গ) মিথ্যা বলা ঘ) উপরের সবগুলোই

সৃজনশীল প্রশ্ন

কিশোর আবদুল কাদির জিলানীর কাফিলা ডাকাত কবলিত হওয়ার পর সেও ডাকাতির শিকার হলো। ডাকাতরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কাছে কি কিছু নেই? সে বললো, কিছু দিরহাম রয়েছে। মা সেগুলো গোপন জায়গায় সেলাই করে দিয়েছেন। ডাকাতরা বললো, গোপন দিরহামের কথা বললে কেনো? সে বললো, মায়ের কাছে ওয়াদা করে এসেছি-সত্য বলবো, তাই। তাঁর আচরণে ডাকাতরা ভালো হয়ে গেলো এবং ডাকাতি ছেড়ে দিল।

ক) সিদক কাকে বলে?
খ) হযরত আবদুল কাদীর সত্য বললেন কেনো? না বললে কী পরিণতি হতো?
গ) বর্তমান সময়ে একজন যুবক কিভাবে নিজেকে সত্যের উপর অধিষ্ঠিত রাখবে?
ঘ) "শুধু সত্য বলার অভ্যাস মানুষকে সবধরনের অন্যায় থেকে রক্ষা করতে পারে" – বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তরমালাঃ **১. ক,** **২. ঘ,** **৩. গ,** **৪. ঘ,**

পাঠ- ৪ : সবর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সবরের পরিচয় বলতে পারবেন
- সবরের বিভিন্ন প্রকার ও পর্যায় জানতে পারবেন
- মানবজীবনে সবরের গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	সবর, ধৈর্যশীলতা, শারীরিক সবর, আত্মিক সবর, সুখে সবর, দুঃখে সবর।

পরিচয়

সবর বা ধৈর্যশীলতা এমন একটি কাঙ্খিত নৈতিক গুণ, যা ছাড়া মানুষ সফলতা ও কল্যাণলাভ করতে পারে না। ব্যক্তি জীবনে যেমন তেমনি সামাজিক জীবনেও সফলতা লাভের প্রথম শর্ত হলো সবর। তা ছাড়া ব্যক্তি পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি স্তরে সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি বা সংরক্ষণেও সবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'সবর' আরবি শব্দ। অর্থ ধৈর্য, বিপদে ধৈর্যধারণ করা, বীরত্ব। সাধারণভাবে সবর হলো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ দৃঢ়তার সাথে সহ্য করা। ইসলামি পরিভাষায় বিষয়টি আরো ব্যাপক।

আল্লামা ইবন কাছীর (র.) বলেন– আল্লাহর পক্ষ থেকে যা আরোপিত হয় তা বান্দার মেনে, এ বিষয়ে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তার দেয়া প্রতিফলের উপর খুশি থাকাকে সবর বা ধৈর্য বলে (তাফসীর ইবনে কাসির ১ম খণ্ড)।

সবরের প্রকারভেদ

প্রাথমিকভাবে সবরকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন– ১। শারীরিক সবর, ২। আত্মিক সবর।

১.শারীরিক সবরঃ

আল্লাহ তাআলার প্রতি এবং তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি আল্লাহ নির্ধারিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সময় মানুষের শারীরিক কষ্ট হয়। কখনো কখনো তাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। এসকল শারীরিক পরিশ্রমের কাজে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন এবং ধৈর্যধারণকে শারীরিক সবর বলা হয়। যেমন, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, অসুস্থ বা আহত রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া, হজ্জ পালনের সময় কষ্ট করা প্রভৃতি।

২.আত্মিক সবরঃ

মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানবিক প্রবৃত্তি দিয়েছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, হিংসা প্রভৃতি এসকল প্রবৃত্তির অন্যতম। এসকল অন্যায় প্রবৃত্তি মানুষকে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার প্রেরণা দেয়। তাকে পাপ করার জন্য প্রলোভিত করে। এমন অবস্থায় পাপচিন্তা ও কর্ম থেকে আত্মাকে পবিত্র রাখার জন্য নিষ্ঠার সাথে ধৈর্য অবলম্বন করাকে আত্মিক সবর বলে।

ইমাম গাযালি (রা) সবরের পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন–

১. সুখ ও আনন্দাবস্থায় সবরঃ সুখের সময়, কৃতিত্ব ও সাফল্যের সময় মানুষ আনন্দ-সাগরে ভাসতে থাকে। সে নীতি-নৈতিকতার বাধা মানতে চায় না। যা খুশি তা করার মানসিকতা গড়ে ওঠে তার মধ্যে। এমন অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সীমালংঘনমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকা হলো সুখ ও আনন্দাবস্থায় সবর।

২. বিপদ-আপদে সবরঃ রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভয়-ভীতি, অভাব-দরিদ্রতা প্রভৃতি বিপদ বিভিন্ন সময়ে মানুষের ওপর পতিত হয়। এমন বিপদে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা, হতাশায় ভেঙে না পড়া এবং অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হলো বিপদ-আপদে সবর।

৩. ইবাদতে সবরঃ আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সকল ইবাদতেই ব্যক্তিকে কিছু না কিছু কায়িক শ্রম ব্যয় করতে হয়। তার সময় ও শক্তি কাজে লাগাতে হয়। নিষ্ঠার সাথে ইবাদত সম্পাদনে এ শ্রম ও শক্তি ব্যয়ে আন্তরিকতা প্রদর্শন হলো ইবাদতে সবর।

৪. অত্যাচারে সবর ইসলাম প্রচারের কাজে বা সমাজে সুনীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্যক্তি মাঝে-মধ্যে অসৎ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির হাতে নিপীড়িত হতে পারেন। এমন অবস্থায় নির্যাতন সহ্য করে ভাল কাজ চালিয়ে যাওয়া হলো অত্যাচারে সবর।

৫. পাপের কাজে সবরঃ পাপের কাজে বাহ্যিকলাভ বেশি, তা করাও দৃশ্যত মনোরম এবং আকর্ষণীয়। পাপের কাজের এই কৃত্রিম আকর্ষণ,লাভ ও সৌন্দর্য উপেক্ষা করে তা থেকে বিরত থাকা হলো পাপের কাজে সবর।

সবরের গুরুত্ব ও ফজিলত

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে 'সবর' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর আদেশ পালনে' বিপদাপদ মুকাবিলায়, শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্যের ভূমিকা অপরিসীম। এ জন্য আল্লাহ ধৈর্যের প্রশিক্ষণ দিতে বলেছেন। এবং এ ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন–

"ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর এবং ধৈর্যের বন্ধনে নিজেদের বেঁধে রাখ।" (সূরা আলে ইমরান ৩: ২০০)

সবর মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। কুরআনে বলা হয়েছে– إِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ "সুনিশ্চিতভাবেই আল্লাহ আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।" (সূরা বাকারা ২: ১৫৩)

যারা ধৈর্যের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন। কুরআনে এসেছে–وَاللهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِينَ "আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ৩:১৪৬)

ধৈর্যশীলদের জন্য পরকালে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। ধৈর্যের ফল স্বরুপ সে জান্নাত লাভ করবে। মহানবি (স.) বলেন– الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّة "ধৈর্যের পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত।" (সহিহ ইবনু খুজায়মা)

সবর ছাড়া ইমান পূর্ণ হয় না। কেননা সবর ইমানের অঙ্গ কিংবা সবরই ইমান। যেমন নবি (স.)বলেন,

الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَان

"ধৈর্য ইমানের অর্ধেক।" (শু'আবুল ইমান)

আল্লাহর সাহায্য ছাড়া মানুষ বিপদ-আপদ মুকাবিলা করতে অক্ষম। তাই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সহায্য চাইতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

"মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও।" (সূরা বাকারা ২: ১৫৩)

সামাজিক জীবনে সবরের গুরুত্ব

সামাজিক জীবনে সবরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সীমাহীন। ইহকাল ও পরকালে সকল বৈষয়িক, ধর্মীয় ও অপার্থিব বিষয়ে সাফল্যলাভে সবর গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

সবরের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। সমাজ অশান্তিতে নিমগ্ন থাকে। সবর এ অবস্থার নিরসন করে। পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে সবর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখে।

রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে সবরহীনতা মানবজাতিকে বিপর্যস্ত করতে পারে।

সমাজের সদস্যরা পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল হলে সমাজ উন্নত হয়। সমাজের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। সবর ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়।

বস্তুত ধর্মীয় ও পরকালীন জীবনেতো বটেই এমনকি পার্থিব বৈষয়িক জীবনেও সবর অনুশীলন ছাড়া সাফল্য লাভের আশা করা যায় না। এ কারণেই বিশেষ করে মুমিনদেরকে সবর অবলম্বন করতে হবে।

সারসংক্ষে

মানুষের মানবিক গুণাবলির মধ্যে সবর নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি মহান আল্লাহর একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের এমন দ্রোহিতা ও কুফরির পরও তিনি মানুষকে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন না। তিনি পরম ধৈর্যশীল। মানুষও যদি এ গুণটির অনুশীলন করে তাহলে ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল স্তরে অভূতপূর্ব সুফল লাভ করতে সক্ষম হবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যক্তিগত জীবনে সবরের সুফল বিষয়ে শিক্ষার্থীগণ একটি প্রবন্ধ লিখে টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। সবর অর্থ কী?

ক) ধৈর্যধারণ করা
খ) ভরসা করা
গ) সেবা করা
ঘ) অন্যের উপকার করা

২। সুখে সবরের অর্থ কী?

ক) সুখ ভোগ না করা
খ) সুখের সময় কষ্ট করা
গ) আনন্দে আত্মহারা হয়ে সীমালংঘন না করা
ঘ) সুখের সময় দান করা

৩। "সবর ইমানের অর্ধাংশ" কার বাণী?

ক) আল্লাহ তাআলা
খ) রাসূলুল্লাহ (স.)
গ) হযরত আবু বকর (রা)
ঘ) হযরত আলী (রা)

৪। আল্লাহ মানুষকে কীভাবে পরীক্ষা করার ঘোষণা দিয়েছেন?

ক) ভয়ভীতি ও ক্ষুধা দিয়ে
খ) জীবন ও শস্যের ক্ষতি দিয়ে
গ) ক ও খ
ঘ) কুরবানি দিয়ে

সৃজনশীল প্রশ্ন

একটি বেসরকারি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসবাহ সাহেব অফিসে ঢুকে দেখলেন, লোকেরা খুব উত্তেজিত। তারা তার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছে এবং তার পদত্যাগ দাবি করছে। তিনি উত্তেজিত হলেন না। তিনি জানেন, লোকেরা কারো প্ররোচনায় মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে এসব করছে। তিনি ধৈর্য ধরে আন্দোলনকারীদের কথা শুনলেন। এরপর তাদের মনোনীত কয়েকজনকে নিয়ে বসলেন এবং তাদেরকে প্রকৃত তথ্য ও হিসাব দেখালেন। আন্দোলনকারীরা লজ্জিত হলো। মিসবাহ সাহেব নিজ পদে আরো সংহত ও সম্মানিত অবস্থান লাভ করলেন।

ক) সবর কাকে বলে?

খ) বৈষয়িক উন্নতির জন্যও সবর কেনো আবশ্যক?

গ) মিসবাহ সাহেব যদি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে আন্দোলনকারীদের পুলিশে দিতেন বা চাকুরিচ্যুত করতেন তার ফল কী হতে পারতো? সবর কীভাবে তার সমস্যার সমাধান করে দিলো?
ঘ) ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সবরের গুরুত্ব কুরআন ও হাদিসের প্রমাণসহ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালাঃ **১. ক,** **২. গ,** **৩. খ,** **৪. গ,**

পাঠ- ৫ : যিকর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- যিকরের পরিচয় বলতে পারবেন
- ব্যক্তিজীবনে যিকরের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- সমাজজীবনে যিকরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	যিকর, আত্মশুদ্ধি, পাপমুক্তি।

পরিচয়

যিকর সুন্দরতম মানব চরিত্রের অন্যতম দিক। এর মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মিক শুদ্ধতা অর্জিত হয়। সে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, পাপাচারমুক্ত ও প্রশান্ত জীবন গড়ে তুলতে পারে। যিকরের প্রভাবে সমাজ জীবনও সৌহার্দ্যপূর্ণ, স্থিতিশীল, সহযোগী এবং শান্তিময় হয়ে ওঠে।

যিকর আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো– স্মরণ করা, মনে রাখা, উল্লেখ করা, বর্ণনা করা, মেনে চলা প্রভৃতি। যিনি যিকর করেন তাকে যাকির বলে। পরম নিষ্ঠার সাথে যিকর সম্পন্নকারীকে বলা হয় মুযাক্কির। যিকরকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যেমন–

ইমাম কুরতুবী (র)-এর মতে, "আল্লাহর বিধান মেনে চলাই যিকর। যে ব্যক্তি তাঁর বিধান মেনে চলে সেই যিকর করে।"

হযরত সাঈদ বিন যুবায়র (র)-এর মতে, "যিকর হলো সকল ক্ষেত্র ও পর্যায়ে আল্লাহর বিধি-নিষেধের প্রতি নি:শর্ত আনুগত্য প্রদর্শন।"

সুফিবাদে যিকর হলো, "সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম স্মরণের মাধ্যমে তাঁর সাথে মানবতার যোগসূত্র বা মিলন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া।"

মোট কথা, মুখে তাসবীহ আকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ, মনে তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণ এবং যে কোনো কাজ করতে গেলে সে সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ স্মরণ করা ও মেনে চলাই যিকর।

ব্যক্তিজীবনে যিকরের গুরুত্ব

ব্যক্তির জীবনযাপন সুন্দর ও সফল করতে যিকরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন–

যিকর চিরকাঙ্ক্ষিত মানসিক প্রশান্তিলাভের উপায়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।" (সূরা রা'দ ১৩: ২৮)

যিকরের মাধ্যেমে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যিকরের মাধ্যমে মানুষ যখনই আল্লাহকে স্মৃতিপটে জাগরুক

করে- সাথে সাথে আল্লাহ তার প্রতিউত্তর দেন। তিনি বলেন–

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করব।" (সূরা বাকারা ২: ১৫২)

মহানবি (স.) বলেছেন– "শয়তান মানুষের অন্তর আঁকড়ে বসে থাকে। এরপর মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার যিকর করে সে বিতাড়িত হয়। আর মানুষ যখন আল্লাহ থেকে গাফিল হয়, তখন শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেয়।" (সহিহ বুখারি)

রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন- "প্রত্যেক বস্তুরই পরিষ্কারক যন্ত্র আছে, আর মানুষের অন্তর পরিষ্কারক যন্ত্র হলো যিকর।" (বাইহাকি)

মহানবি (স.) বলেন– "যে ঘরে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ হয়না সে ঘর মৃত ঘরের ন্যায়। (সহিহ মুসলিম)

যিক্‌র যেমন ছাওয়াবের কাজ তেমনি যিক্‌র বিমুখতা পরকালে শাস্তির কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَمَنْ يُّ عْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّه يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا

-" যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।" সূরা জ্বিন ৭২:১৭)

যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন আমাদের উচিত তাঁকে বেশি বেশি স্মরণ করা। তিনি তাঁকে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

"হে ইমানদারগণ! তোমরা অধিক মাত্রায় আল্লাহর যিকর কর।" (সূরা আহযাব ৩৩: ৪১)

মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمٰى

"যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে অবশ্যই তার জীবন-যাপন হবে সঙ্কুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠাব।" (সূরা ত্বা-হা ২০: ১২৪) যিকরের মাধ্যমে এ ক্ষতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

তাকওয়া, ইমান ও তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি

যিকিরের মাধ্যমে মানুষের ইমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"নিশ্চয়ই মুমিন তারা, যখন আল্লাহর যিকর করা হয় তখন যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে,যখন তাদের নিকট আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় তখন তাদের ইমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা করে।" (সূরা আনফাল ৮: ২)

সারসংক্ষেপ

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তাআলার হুকুম স্মরণ করা এবং সে অনুসারে কাজ করার নাম যিকর। এভাবে যদি একজন মানুষ কাজ করে তাহলে তার জীবন সব রকমের কল্যাণ ও পূর্ণতায় ভরে উঠতে পারে। সে নিজেও লাভ করতে পারে দুনিয়া ও আখিরাতে পরম সফলতা।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	যিকর কী? শিক্ষার্থীগণ পরস্পর শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবেন, টিউটর আলোচনা পরিচালনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। যিকর অর্থ কী?

ক) স্মরণ করা, মনে রাখা
খ) ধৈর্যধারণ করা
গ) সদাচারণ করা
ঘ) আল্লাহকে ভয় করা

২। অন্তরসমূহ কী দ্বারা প্রশান্ত হয়?

ক) দ্বীনি ফিকর দ্বারা
খ) দ্বীনি মেহনত দ্বারা
গ) আল্লাহর যিকর দ্বারা
ঘ) উত্তম আচরণ দ্বারা

৩। হযরত রাসূলুল্লাহ (স)এর ঘোষণা অনুসারে মানুষের অন্তর পরিষ্কারক যন্ত্র কোনটি?

ক) তাকওয়া
খ) যিকর
গ) তওবা
ঘ) তাওয়াক্কুল

৪। আল্লাহর নামের যিকরে মুমিনদের অন্তরের কী অবস্থা হয়?

ক) অন্তর কেঁপে ওঠে
খ) অন্তর খুশিতে ভরে যায়
গ) অন্তরে প্রবল প্রেম জেগে ওঠে
ঘ) অন্তরে ভয়ানক ভয় তৈরি হয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

আজগর সাহেব চালের বড় ব্যবসায়ী। তার পোষাক পরিচ্ছদ দেখে তাকে খুবই ভদ্র এবং সৎলোক বলে মনে হয়। কিন্তু ক্রেতারা প্রায়ই তার বিরূদ্ধে ওজনে কম দেয়ার অভিযোগ করে। ভালো চালের সাথে মন্দ চাল মেশানো এবং চালের মধ্যে পাথর থাকার অভিযোগ করে। বিষয়টি সম্পর্কে আজগর সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, ব্যবসায়ে এইসব একটু–আধটু করতে হয়। এ কথা শুনে মাওলানা নেসারআলী বলেন, এটা ঠিক নয়, মনে প্রাণে আল্লাহর কথা স্মরণ করে যিকির করলে তুমি ফল পাবে। আল্লাহর তাআলা তোমার ব্যবাসায় বরকত দিবেন।

ক) যিকর কাকে বলে?

খ) বাহ্যিকভাবে দেখতে সৎলোক বলে মনে হলেও আজগর সাহেব আসলে মন্দ কাজ করেন। এর করণ কী?

গ) যিকর কীভাবে আসগর সাহেবকে এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদেরকে মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখতে পারে?

ঘ) যিকরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তরমালাঃ ১. ক, ২. গ, ৩. ক, ৪.ক,

পাঠ- ৬ : শোকর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শোকরের পরিচয় বলতে পারবেন
- শোকরের প্রকার ও শর্ত বর্ণনা করতে পারবেন
- মানবজীবনে শোকরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	শোকর, ইলম, হাল, আমল।

পরিচয়

ব্যক্তিজীবনকে সুন্দর, সফল ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলার জন্য ইসলামে যে সকল অভ্যাস ও গুণ অনুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে শোকর অন্যতম। শোকর করার পদ্ধতি ও প্রকৃতি যেমন ভিন্ন তেমনি এর শর্ত বা রোকনও একাধিক।

শোকর আরবি শব্দ। অভিধানে শব্দটি সাধারণভাবে কৃতজ্ঞতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অন্যান্য অর্থগুলো হচ্ছে- উপকারীর উপকার স্বীকার করা, উপকারীর উপকারের প্রতি বিনম্রচিত্তে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা। শোকরকারীকে বলা হয় শাকির।

ইসলামি শরীয়াতের পরিভাষায় মহান আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ও রহমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে শোকর বলে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষকে দেওয়া আল্লাহর নিয়ামতের কোনো সংখ্যা নেই, সীমা নেই।

মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا

"যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তাহলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না।" (সূরা ইবরাহিম ১৪: ৩৪) শোকর মূলত নিজের অসহায় অবস্থা এবং তার বিপরীতে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের বিপুলত্বের কারণে কৃতজ্ঞতা পোষণের অক্ষমতার উপলব্ধি।

সুফিগণ বলেন, "দেহ ও মন একত্রিত করে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর নির্দেশিত পথে যাবতীয় নিয়ামত ব্যয় ও ব্যবহার করাই শোকর।"

এক কথায়, শোকর হলো নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিয়ামত ভোগ, ব্যবহার এবং এ বিপুল নিয়ামতের কথা মনে রেখে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা।

শোকরের প্রকারভেদ

শোকরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১.সুখের অবস্থায় শোকর

মানুষের পার্থিব জীবনে কাঙ্ক্ষিত বিষয় হলো সুখ। বলা যায়, তার পার্থিব সকল চেষ্টা, সাধনা, শ্রম, লেন-দেন, সামাজিকতা সবকিছুরই মূল লক্ষ্য হলো সুখী হওয়া। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ও নিয়ামত হিসেবে মানুষ সুখ লাভ করে।

এরূপ সুখী অবস্থায় আল্লাহর রহমত ও নিয়ামতের বিনিময়ে তাঁর আরও বেশি ইবাদতে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে শোকর বা কৃতজ্ঞতা পোষণ করাই সুখের অবস্থায় শোকর।

২.দুঃখের অবস্থায় শোকর

দুঃখ-বিপদ-ক্ষতি মুমিনের জন্যে আল্লাহর বিশেষ পরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করব ভয়ভীতি, ক্ষুধা, সম্পদের ক্ষতি, জীবনের হুমকি ও ফসল বনষ্ট করে।" (সূরা বাকারা ২: ১৫৫)

এ জন্য মুমিন ব্যক্তি যখন বিপদে নিপতিত হয় তখনো তাকে শোকর অব্যাহত রাখতে হয়। কেননা দুঃখ-কষ্ট, বিপদ ও ক্ষতি মূলত সুখ ও আনন্দেরই পূর্বাভাস। মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا .

"নিশ্চয় দুঃখের সাথে সুখ আছে। অবশ্যই দুঃখের পরে আসে সুখ।" (সূরা ইনশিরাহ ৯৪: ৫-৬)

দুইঅবস্থার শোকরের কথা উল্লেখ করে মহানবি (স.) ইরশাদ করেন– "মুমিনগণ যখন সুখে থাকে তখন আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। আর যখন দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয় তখন ধৈর্যধারণ করে।" (সহিহ মুসলিম)

শোকরের শর্ত বা পদ্ধতি

ইমাম গাযালি (র) শোকরের তিনটি শর্ত বা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো- ১. ইলম ২. হাল ও ৩. আমল।

১.ইলম বা শোকর বিষয়ক জ্ঞান

মানুষকে দেয়া আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানকে ইলম বলা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি বুঝতে ও জানতে পারে যে, তার জন্ম, বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য সকল বস্তু ও উপাদান আল্লাহর অবিস্মরণীয় দান। জীবনের প্রতিটি পদে, শ্বাস-প্রশ্বাসে, অণু-পরমাণুতে আল্লাহর নিয়ামত ভোগের পর শোকর জ্ঞাপন যে তার দায়িত্ব সে সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা লাভই ইলম।

২.হাল বা শোকরের অবস্থা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সমীপে শোকর জ্ঞাপনের সময় যে বিনয় ও আনুগত্য দেহ-মনকে আচ্ছাদিত করে তাকে শোকরের হাল বা অবস্থা বলা হয়। আল্লাহর শোকর জ্ঞাপনের জন্যে এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। হাল ব্যতীত শোকর জ্ঞাপন নিছক নিফাকীতে পরিণত হয়।

৩.আমল বা শোকর জ্ঞাপনের কাজ

শোকর জ্ঞাপনের জ্ঞান ও অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর ব্যক্তির পক্ষ থেকে শোকর জ্ঞাপনের বাহ্যিক ও আন্তরিক প্রকাশই আমল বা শোকর জ্ঞাপনের কাজ। সে আল্লাহর নিয়ামত কেবল তাঁর নির্দেশানুসারে কর্মব্যস্ত রাখবে এবং তাঁর নির্দেশানুযায়ী কর্ম থেকে বিরত রাখবে। এভাবে জীবনের সকল পর্যায়ে আল্লাহর আইনের বাস্তব অনুশীলনই হলো আমল বা শোকর জ্ঞাপনের কাজ।

শোকরের গুরুত্ব ও ফজিলত

শোকরের গুরুত্ব ও ফজিলত অনেক। শোকরে আল্লাহর নির্দেশ পালিত হয়। আল্লাহ বলেন–

وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

"আর তোমরা আমার শোকর কর। কিন্তু অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকার করো না।" (সূরা ২: ১৫২)

আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের শোকর করলে আল্লাহ তাআলা শোকরকারীর প্রতি নিয়ামত দানের গতি বৃদ্ধি করেন। তিনি বলেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

"তোমরা যদি শোকর কর তবে তোমাদের নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দেব।" (সূরা ইবরাহীম ১৪: ৭)

আল্লাহ শোকরকারীদের বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করবেন। তিনি বলেন– "অচিরেই আল্লাহ শোকর জ্ঞাপনকারীদের পুরস্কৃত করবেন।" (সূরা আলে ইমরান ৩: ১৪৪)

আল্লাহর শোকর না করলে কঠিন আযাবের শিকার হতে হবে। আল্লাহ বলেন–

وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيدٌ

"যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে জেনে রাখ, আমার আযাব খুবই কঠিন।" (সূরা ইবরাহিম ১৪: ৭)

তাই শোকরের মাধ্যমে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়।

শোকর করা ইমানের অনিবার্য দাবি। প্রিয়নবি (স.)বলেন- "মুমিন ব্যক্তিকে যখন সুখ স্পর্শ করে, সে শোকর করে। যখন

তাকে দুঃখ স্পর্শ করে, সে সবর করে।" (সহিহ মুসলিম)
মানুষের উপকার ও সহানুভূতির কৃতজ্ঞতা পোষণের বিষয়টিও শোকরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, নবি (স.)বলেন-"যে ব্যক্তি মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।" (সুনান তিরমিযি)
শোকর সামাজিক শান্তির অব্যর্থ হাতিয়ার। সমাজের লোকেরা যদি আল্লাহর প্রতি এবং নিজেদের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণের এ ধারা অব্যাহত রাখে তাহলে সমাজ শান্তি, সৌহার্দ্য, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার পবিত্রালোকে উদ্ভাসিত না হয়ে পারে না।

সারসংক্ষেপ

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সুন্দর, শোভন, সফল ও কল্যাণময় করে তোলার একটি কার্যকর মাধ্যম হলো শোকর। এর মাধ্যমে মানুষ অন্য মানুষের প্রতি এবং চূড়ান্তভাবে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অভ্যস্ত হয়। পরিণতিতে তারা অন্যের উপকারে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে ওঠে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শোকরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। শোকর অর্থ কী?
ক) ধৈর্যধারণ করা
খ) কৃতজ্ঞতা পোষণ করা
গ) স্মরণ করা, মনে রাখা
ঘ) ইবাদাত করা

২। দুঃখের অবস্থায় শোকরের অর্থ কী?
ক) ধৈর্যধারণ করা
খ) অবিরাম কাজ করা
গ) দুঃখের কারণে সন্তুষ্ট হওয়া
ঘ) হাসি–আনন্দে দুঃখ ভোলার চেষ্টা করা

৩। শোকরের রোকন গুলো কী কী?
ক) ইজাব ও কবূল
খ) আযীমত ও রুখসাত
গ) ইলম, হাল ও আমল
ঘ) ইলম ও আমল

৪। যদি তোমরা শোকর করো–
ক) আমি অবশ্যই বাড়িয়ে দেবো
খ) আমি উত্তম প্রতিদান দেবো
গ) আমি সন্তুষ্ট হবো
ঘ) আমিও শোকর করবো

সৃজনশীল প্রশ্ন

মারইয়াম অন্ধ ও দরিদ্র এক নারী। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি গরীব এবং অন্ধ। আপনার খারাপ লাগে না? তিনি বললেন, আমার দুইহাত ও দুইপা সুস্থ। শরীরও সুস্থ। আমি প্রয়োজনীয় কাজ এগুলোর মাধ্যমে করি। আল্লাহ যদি আমাকে এগুলোও না দিতেন, আমার কী করার ছিল? আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট দিয়েছেন!

ক) শোকর কাকে বলে?

খ) শোকরের রোকন কয়টি ও কী কী?

গ) মারইয়ামের এরূপ চিন্তাধারা কীভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে? লিখুন।

ঘ) মানবজীবনে শোকরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: **১. খ,** **২. ক,** **৩. গ,** **৪. ক,**

পাঠ- ৭ : তাওয়াক্কুল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তাওয়াক্কুলের পরিচয় বলতে পারবেন
- তাওয়াক্কুলের সোপান বা স্তরগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন
- মানবজীবনে তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	ভরসা, উকীল, অভিভাবকত্ব।

পরিচয়

তাওয়াক্কুল (تَوَكَّل) অর্থ হলো ভরসা করা, নির্ভর করা, কোনো কাজ বা বিষয়ে কারো উপর দায়িত্ব দিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া। কোনো প্রাপ্তি বা অর্জনের ব্যাপারে একান্তভাবে কারো ওপর নির্ভর করা।

তাওয়াক্কুল শব্দটি 'ওকালত' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ অপরের উপর ভরসা করে কাজ সমর্পণ করা। যাকে কাজ সমর্পণ করা হয়, তাকে উকিল এবং যে সমর্পণ করে তাকে মুতাওয়াক্কিল বা মক্কেল বলা হয়। একজন মানুষ সাধারণত অন্য একজন মানুষের কাছে তখনই তার কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে যখন সে তার চূড়ান্ত বিচক্ষণতা, সত্য প্রকাশে পূর্ণ সক্ষমতা, চূড়ান্ত বাকপটুতা এবং মক্কেলের প্রতি তার পূর্ণ সহানুভূতির সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পায়।

ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, "তাওয়াক্কুল অন্তরের কাজ। একে মুখের দ্বারা বলা কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বান্দার পক্ষ থেকে নিজ কাজের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে দেয়ার নামই তাওয়াক্কুল।"

ইমাম গাযালি (রহ.) বলেন, "ইমানের প্রকারসমূহের মধ্যে তাওয়াক্কুলও একটি। এর মূল হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান। এর ফলাফল হচ্ছে আমল বা কাজ। এরপর তাওয়াক্কুল শব্দটির উদ্দিষ্ট অর্থ হচ্ছে এর হাল বা অবস্থা।"

ইসলামি পরিভাষায় তাওয়াক্কুল বলতে একান্তভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করা বুঝায়। এর চূড়ান্ত রূপ হলো, মানুষের অন্তরে সুদৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে একথা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে, সবকিছুর নিয়ন্তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

তাওয়াক্কুলের স্তর বা সোপান

শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে তাওয়াক্কুলের তিনটি স্তর বা সোপান রয়েছে। যেমন,

প্রথম স্তর : আল্লাহ তা'আলার ওপর এমন ভরসা করা, যেমন মক্কেল তার উকিলের ওপর ভরসা করে। এটা তাওয়াক্কুলের সর্বনিম্ন স্তর।

দ্বিতীয় স্তর : আল্লাহ তা'আলার ওপর এমন ভরসা করা, যেমন শিশু তার মায়ের ওপর করে। সে মা ব্যতীত অন্য কাউকে চেনে না, তাকে ছাড়া আর কারো কাছে ফরিয়াদও করে না। একান্তভাবে মায়ের ওপরই ভরসা করে। মায়ের অনুপস্থিতিতে কষ্টের সম্মুখীন হলে সে প্রথমে মাকেই ডাকে এবং তাঁর কথাই প্রথমে মনে আসে। কেননা তার ঠিকানা মা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার মধ্যে মনোনিবেশ করে, লক্ষ্য ও আস্থা তাঁর প্রতিই নিবদ্ধ রাখে, সে আল্লাহর উপরই পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করবে। যেমন শিশু তার মায়ের উপর নির্ভর করে থাকে। এ স্তরের তাওয়াক্কুল প্রথম স্তরের তাওয়াক্কুলের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

তৃতীয় স্তর : আল্লাহর তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তি নিজের গতিবিধিতে এমন হওয়া, যেমন মৃত ব্যক্তি গোসলদাতার হয়ে থাকে। অর্থাৎ নিজেকে মৃত মনে করা, যাকে কেবল খোদায়ী কুদরতই গতিশীল করে থাকে। মৃতব্যক্তি নি:সাড় চেতনাহীন। আর গোসলদাতার হাত তাকে ধৌত করে। এভাবে তাওয়াক্কুলকারীর সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকে, গতিশীলতা, ইচ্ছা, জ্ঞান ও অন্যান্য যাবতীয় গুণাবলি আল্লাহ তা'আলাই জারি করেন। এ স্তরের তাওয়াক্কুলকারী আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও দানে ভরসা করে সওয়াল ও দোয়া বর্জন করে এবং মনে করেন, তিনি সওয়াল ছাড়াই সওয়ালের চেয়ে উত্তম দান পাবেন।

তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর ওপর ভরসা করার প্রকৃতি ও রীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, ভরসা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ভরসা করার ক্ষেত্রে মানুষের করণীয় ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন ঘোষণায় তাওয়াক্কুল সম্পর্কে অত্যন্ত সহজবোধ্য যে ধারণা পাই– তা হলো–

আল্লাহর অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি

আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, জীবনদাতা, রিযিকদাতা। মানুষের যা কিছু আছে তা তাঁরই দেয়া। আর ভবিষ্যতে মানুষ যা পাবে, তাও তাঁরই নিয়ামাত। কাজেই মানুষের প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার এই দান স্বীকার করে নেয়া। তাঁর অভিভাবকত্বে নিজের জীবন, সম্পদ তথা সবকিছু সমর্পন করা।

ইমানের প্রধান দাবি

মুমিন হতে হলে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। আল্লাহর ওপর ভরসা করা ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারবে না। কেননা কেবল মুমিনই আল্লাহর অসীম ক্ষমতার উপর ইমান পোষণ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

"আল্লাহর ওপরই মুমিনদের নির্ভর করা কর্তব্য।" (সূরা ইবরাহিম ১৪:১১)

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلًا

"আপনি আল্লাহর ওপর নির্ভর করুন আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আহযাব ৩৩ : ৩)

আল্লাহ সকল ক্ষমতার উৎস

তাওয়াক্কুল এই শিক্ষা দেয় যে, মহান আল্লাহ সকল ক্ষমতার উৎস। কাজেই ভালো হোক বা মন্দ হোক, তা আল্লাহর ক্ষমতাতেই হয়। যাঁরা তাওয়াক্কুল করে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে তার সাফল্য বা ব্যর্থতার ব্যাপারে একান্তভাবে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে। ফলে তারা হতাশায় নিপতিত হয় না।

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

আপনি তাদেরকে বলুন : 'তিনিই পরম করুণাময়, আমরা তাঁর ওপর ইমান রাখি এবং কেবল তাঁর ওপরই নর্ভরকরি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।' (সূরা মুল্‌ক ৬৭ : ২৯)

অফুরন্ত জীবিকা লাভ

যাঁরা একান্তভাবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে পারে তাদের জীবিকার জন্য দুঃশ্চিন্তা করতে হয় না। বরং পরম করুণাময় নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অফুরন্ত জীবিকা দান করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযথভাবে তাওয়াক্কুল করতে পার, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তেমনিভাবে জীবিকা দান করবেন যেভাবে তিনি পাখিদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকেন। পাখিরা খালি পেটে বের হয় আর দিনশেষে ভরা পেটে বাসায় ফিরে আসে।" (সুনানে তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ)

তাওয়াক্কুল সতর্ক থাকা নিষেধ করে না

আল্লাহর উপর ভরসার অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তি শত্রুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে অথবা কোনো ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনো চেষ্টা করবে না বা শত্রুর হামলা থেকে বাঁচার জন্য লড়াই করবে না। বরং এর অর্থ হলো সে নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করবে। এরপর সফলতার ব্যাপারে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে।

আল্লাহর ওপর নির্ভর করার অর্থ এটা নয় যে, ব্যক্তি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে। এর অর্থ হলো, আল্লাহ যা আদেশ করেছেন, তা করতে হবে। তিনি যা করতে বলেছেন তাতে কোনো রকম আলস্য বা অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না। আর তিনি যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তা থেকেও নিষ্ঠার সাথে বিরত থাকতে হবে।

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তাআলা সকল ক্ষমতার মালিক। তিনি যদি দিতে চান, পৃথিবীর সকলে মিলেও তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে না। তিনি যদি দিতে না চান, পৃথিবীর সকলের সম্মিলিত চেষ্টায়ও তা লাভ সম্ভব না। এ কারণে মুমিনদের একান্তভাবে আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করা আবশ্যক। ইসলামে তাওয়াক্কুলের দর্শন তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	তাওয়াক্কুল কিভাবে করতে হবে? শিক্ষার্থীগণ পরস্পর আলোচনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। তাওয়াক্কুল অর্থ কী?
- ক) প্রত্যাবর্তন করা
- খ) নির্ভর করা
- গ) চেষ্টা করা
- ঘ) কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা

২। তাওয়াক্কুলের সোপান কয়টি?
- ক) ৩টি
- খ) ৫টি
- গ) ৭টি
- ঘ) ৯টি

৩। যারা ইমান এনেছে তাদের ওয়ালী বা অভিভাবক কে?
- ক) আমিরুল মুমিনীন
- খ) পীরে কামেল
- গ) হযরত মুহাম্মাদ (স)
- ঘ) আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা

৪। মানুষের একমাত্র কার উপর ভরসা করা উচিত?
- ক) নিজের বিবেকের উপর
- খ) নিজের অর্থ ও ক্ষমতার উপর
- গ) নিজের লোকবলের উপর
- ঘ) আল্লাহ তাআলার উপর

সৃজনশীল প্রশ্ন

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, পৃথিবীতে আড়াই কোটির বেশি প্রজাতির প্রাণি রয়েছে। এর মধ্যে তাঁরা কেবল ৫০ লাখ প্রজাতি সম্পর্কে গবেষণা করেছেন, কিছু কিছু জেনেছেন। এ সকল প্রজাতির মধ্যে মানুষ ব্যতীত বাকী সবাই পরম করুণাময় আল্লাহর উপর ভরসা করে। তথ্যটি জানার পর আহনাফ নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়। সে একান্তভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ক) তাওয়াক্কুল কাকে বলে?

খ) তাওয়াক্কুলের সোপান কয়টি ও কী কী?

গ) আহনাফের নতুন উপলব্ধি তার জীবনে কী কী প্রভাব বিস্তার করবে? বর্ণনা করুন।

ঘ) তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ক, ৩. ঘ, ৪. ঘ,

পাঠ- ৮ : ইহসান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ইহসানের পরিচয় বলতে পারবেন
- ইহসানের প্রকার বর্ণনা করতে পারবেন
- মানব জীবনে ইহসানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	সদাচরণ, স্রষ্টার প্রতি ইহসান, সৃষ্টির প্রতি ইহসান

পরিচয়

ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও সামাজিক উন্নয়নের জন্যে সমাজের সদস্যদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলাম যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে সেটি হলো ইহসান বা সদাচরণ। পার্থিব ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি এটি জীবনকেও আপন মহিমায় উদ্ভাসিত করে তোলে।

ইহসান শব্দটি আরবি। আল হুসনু শব্দ থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'হুসনুন' অর্থ সুন্দর। সুতরাং আভিধানিক দিক দিয়ে ইহসান অর্থ সুন্দর আচরণ করা। এ ছাড়াও অভিধানে 'ইহসান' কে উত্তম কাজ করা, কোনো কাজকে সুন্দর ও নির্ভেজাল করা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করা, প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

সাধারণ অর্থে, দান করা, সৎ ও কল্যাণকর কাজ করা, উপকার করা এবং উত্তম ব্যবহার করা হলো ইহসান।

মুহাদ্দিসগণ বলেন, বিনয় ও নম্রতার সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মানবীয় বৃত্তির সংশোধন এবং শালীন ও শোভনভাবে কাজ সম্পাদনই ইহসান।

মহানবি (স.) বলেছেন, "ইহসান হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ তা সত্ত্বেও ন্যূনতম এই উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া যে, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।" (সহিহ বোখারি, মুসলিম)

আলিম গণের মতে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে উত্তমরূপে সম্পাদন করাই ইহসান।

এক কথায় বললে, ইহসান হলো সব রকমের সম্ভাব্য সদাচার।

ইহসানের প্রকারভেদ

ইহসানকে দু'টি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন- ১। স্রষ্টার প্রতি ইহসান ২। সৃষ্টির প্রতি ইহসান।

১.স্রষ্টার প্রতি ইহসান

বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আল্লাহ তা'লার প্রতি ইহসান হলো তাঁর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন ও মানুষ জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয-যারিয়াত ৫১: ৫৬)

আল্লাহ তাআলার ইবাদতের অর্থ হলো তিনি যে কাজ করার নির্দেশ ও অনুমতি দিয়েছেন সেগুলো করা এবং যে সকল কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তা থেকে বিরত থাকা। সকল ক্ষেত্রে স্রষ্টার নির্দেশনানুযায়ী, যথার্থ ও যথোপযুক্তভাবে কাজ সম্পাদনই ইহসান।

২. সৃষ্টির প্রতি ইহসান

সৃষ্টির প্রতি ইহসান মূলত স্রষ্টার প্রতি ইহসানেরই অংশ বিশেষ। কেননা আল্লাহর নির্দেশেই এ ইহসান সম্পন্ন হয়। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশি, দুস্থ, নিরন্ন ও বিপদগ্রস্ত মানুষ এবং পশুপাখি, গাছ-পালা, পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি সযত্ন মানসিকতা পোষণ এবং আল্লাহ অনুমোদিত আচরণ প্রদর্শনই সৃষ্টির প্রতি 'ইহসান'।

মহানবি (স.) বলেন, "পৃথিবীর সব কিছুর প্রতি রহম কর, আকাশবাসীরা তোমাদেরকে রহম করবে।" (জামি তিরমিযি)

ইহসানের গুরুত্ব

ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ বিশ্লেষণ করলে ইহসানের বিপুল গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়।

মহান আল্লাহ বলেন–

اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।" (সূরা নাহ্ল ১৬:৯০)

ইহসান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি মানুষ তাই ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল।

ইহসানের মাধ্যমে আল্লাহর সংসর্গ ও নৈকট্যলাভ সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

" তোমরা ইহসান কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা বাকারা ২ : ১৯৫)

মহান আল্লাহ বলেন–

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

"তোমরা যদি অন্যের প্রতি ইহসান কর- তা যেন নিজেকেই ইহসান করলে, আর যদি অপকার কর তাহলে তোমারও অপকার হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭: ৭)

মানুষের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত ও দানের কোন সীমা পরিসীমা নেই। ব্যক্তির ইহসান এই সীমাহীন দানের কৃতজ্ঞতা মাত্র। মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

"আল্লাহ তোমাদের প্রতি যেমন ইহসান করেছেন, তুমিও সেরূপ ইহসান কর।" (সূরা কাসাস ২৮: ৭৭)

ব্যক্তি যখন অন্য মানুষের প্রতি ইহসান বা ভালোবাসা প্রদর্শন করে- তখন সেও বিপুল মানুষের ভালোবাসায় ধন্য হয়ে ওঠে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

"ইহসানের বিনিময় ইহসান ছাড়া আর কি ?" (সূরা আর রহমান ৫৫: ৬০)

মহানবি (স.) বলেন– "তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের ওপর ইহসান কর, আকাশের অধিবাসীরা তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন।" (জামি তিরমিযি)

সারসংক্ষেপ

মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা শান্তি, কল্যাণ, সহানুভূতি, সহযোগিতা, ভালোবাসা ও সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবনযাপনের যে বিধান প্রদান করেছেন ইহসান তার মৌলিক চেতনা, প্রধান প্রাণপ্রবাহ। ব্যক্তিজীবনে যেমন, তেমনি সমাজজীবনেও এটি অত্যন্ত

তাৎপর্যবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। এর মাধ্যমে ব্যক্তি মূলত নিজেকেই আল্লাহ তাআলা ও মানুষের ইহসানের যোগ্য করে তোলে, যাতে তার সামগ্রিক মুক্তি ও সফলতা নিশ্চিত হয়।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ শ্রেণি কক্ষে বাস্তবে ইহসান কিভাবে করতে হয় তা আলোচনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইহসান অর্থ কী?

ক) সুন্দর করা, সদাচরণ করা
খ) ধৈর্যধারণ করা
গ) সাহায্য করা
ঘ) ন্যায়বিচার করা

২। ইহসান কত প্রকার?

ক) ২ প্রকার
খ) ৩ প্রকার
গ) ৪ প্রকার
ঘ) ৫ প্রকার

৩। পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি ইহসান করলে আকাশের অধিবাসীদের নিকট থেকে কী আচরণ পাওয়া যাবে?

ক) ইহসান
খ) ক্ষমা
গ) অশেষ পুরস্কার
ঘ) নাজাত

৪। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি ইহসান করে, মূলত এই ইহসান সে নিজেকেই করে। কীভাবে?

ক) আল্লাহ তাকে ইহসান করেন
খ) ইহসানকৃত তাকে ইহসান করে
গ) দুনিয়া ও আখিরাতে সে এর উত্তম প্রতিদান পেয়ে থাকে
ঘ) সবগুলোই সঠিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

চুরির অপরাধে একজন লোক দোষী সাব্যস্ত হলেন। আশরাফ বললো, আসুন আমরা এর প্রতি ইহসান করি। একে শাস্তি দিই না। সমাজের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন- এর নাম ইহসান নয়। বরং একে শাস্তি দেয়াই হবে এর প্রতি ইহসান। কারণ যে যেমন আচরণের হকদার তার সাথে তেমন আচরণকেই ইহসান বলা হয়।

ক) ইহসানের পরিচয় দাও?

খ) দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর কাউকে শাস্তি না দেয়া ইহসান নয় কেনো?

গ) ইহসানের মাধ্যমে কীভাবে সকলের সাথে যেমন আচরণ আবশ্যক তেমন আচরণ করা সম্ভব? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) মানবজীবনে ইহসানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ক, ৩. ক, ৪. ঘ,

পাঠ- ৯ : কর্তব্যপরায়নতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় বলতে পারবেন
- কর্তব্যপরায়ণতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- মানবজীবনে কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	কর্তব্য, মানবাধিকার সংরক্ষণ, জাতীয় উন্নয়ন, মানবিক মূল্যবোধ।

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলিফা। সে কোনো উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি নয়। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। সেই লক্ষ্য হলো কর্তব্য পালন করা। আল্লাহ মানুষের জন্য কিছু কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত, কিছু পারিবারিক আর কিছু হলো সামাজিক। মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিহিত রয়েছে এই কর্তব্যসমূহ পালন করা বা না করার উপর।

কর্তব্যপরায়ণতা

কর্তব্য হলো এমন বিষয় যা পালন করা স্বভাবতই মানুষের দায়িত্বভুক্ত। আর দায়িত্বভুক্ত বিষয়সমূহ পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা হচ্ছে কর্তব্যপরায়ণতা। কর্তব্য অর্থ করণীয়। যেসব কাজ বা বিষয় সম্পন্ন করা আমাদের জন্যে অপরিহার্য তাকে কর্তব্য বলে। কাজেই কর্তব্যপরায়ণতা অর্থ হবে কাজ সম্পাদনে সচেতন আগ্রহ ও আত্মনিয়োগ। সংক্ষেপে, অর্পিত বা স্বভাবগত দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালন করাই কর্তব্যপরায়ণতা।

কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সুখী ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন। যেমন –

ব্যক্তি কর্তব্যপরায়ণ হলে সে নিজের ও সমাজের সকল কাজ নিষ্ঠাপূর্ণভাবে সম্পন্ন করে। ফলে পার্থিব জীবনে বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে সে আখিরাতেও উন্নতি লাভের যোগ্য হয়ে ওঠে।

ব্যক্তি কর্তব্যপরায়ণ হলে সে উপার্জন করতে পারে। সফল ও স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে সে মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়।

জন্মগতভাবেই প্রতিটা মানুষ কিছু না কিছু যোগ্যতা ও প্রতিভার অধিকারী। ব্যক্তি কর্তব্যপরায়ণ হলে এ সকল যোগ্যতার বিকাশ ঘটে। তার পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব হয়।

কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি সময়ের কাজ সময়ে করে এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে যথাযথভাবে করে। ফলে জীবনের অধিকাংশ জটিলতা থেকে সে মুক্তিলাভ করে।

কোনো জনপদের জাতীয় উন্নতি, অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত হলো সরকার ও জনগণের পারস্পরিক কর্তব্যবোধ। কাজেই সামাজিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে কর্তব্যপরায়ণতার বিকল্প নেই।

মানুষকে আল্লাহ বিপুল দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মূলত এ দায়িত্বে আঞ্জাম দিয়ে মানুষ নিজেকে আরো মর্যাদাবান করতে পারে। পারে আল্লাহপ্রদত্ত মর্যাদা সংরক্ষণ করতে।

মুসলিম জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো– মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া। এ দায়িত্ব পালন সমাজকে সৎকাজের উপযোগী করবে, সমাজ থেকে অন্যায় ও অশালীন কাজ বিদূরীত করবে।

মানুষের প্রতি মানুষের বিস্তারিত কর্তব্য রয়েছে। এ সকল কর্তব্য পালন করলে সমাজে সুস্থতা, স্থিতিশীলতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছলতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমাজ পরিণত হবে আদর্শ সমাজে।

রাসূল (স.)বলেছেন– "সাবধান হও! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সহিহ মুসলিম) প্রকৃতই মানুষ সামষ্টিক দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে। এ সকল দায়িত্ব পালন ছাড়া পরকালে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

বস্তুত কর্তব্যহীন বা কর্তব্যপরায়ণতার চেতনাহীন মানুষ আর পশুতে কোনো তফাৎ নেই। কেননা বিপুল দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন থেকে একমাত্র পশুদের পক্ষেই জীবনযাপন করা সম্ভব। আর মানুষকে শান্তিপূর্ণ ব্যক্তি ও সমাজজীবন গড়তে চাইলে অবশ্যই কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে।

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দায়িত্ব ও কর্তব্যহীন হিসেবে সৃষ্টি করেননি। প্রত্যেক মানুষেরই কোনো না কোনো কর্তব্য রয়েছে। নিষ্ঠা ও সততার সাথে এ সকল কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করাকে কর্তব্যপরায়ণতা বলা হয়। ইসলামে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে লোক আল্লাহ তাআলার ক্ষমতায় ইমান রাখে সে কর্তব্যপরায়ণ হতে বাধ্য। কারণ সে জানে, পৃথিবীর সকলকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হলেও আল্লাহকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। এ কারণে মুসলমানগণ স্বভাবতই কর্তব্যপরায়ণ হয়ে থাকেন।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ, কর্তব্যে অবহেলা করলে কী ধরণের ক্ষতি হতে পারে, এ বিষয়ে শ্রেণি কক্ষে আলোচনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। যা পালন করা স্বভাবতই মানুষের দায়িত্বভুক্ত এমন বিষয়কে কী বলা হয়?

ক) কর্তব্য খ) স্বভাব গ) নিষ্ঠা ঘ) মানবিকতা

২। "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে" – কার বাণী?

ক) আল্লাহ তাআলার খ) রাসূলুল্লাহ (স.)এর

গ) হযরত আবু বকর (রা)এর ঘ) হযরত উমর (রা)এর

৪। কর্তব্যপরায়ণতার প্রতিক্রিয়া কী?

ক) সকল লোক সঠিকভাবে কাজ করে খ) সকল পর্যায়ে অপচয়–লুণ্ঠন বন্ধ হয়

গ) সমাজ সকল বিশৃঙ্খলামুক্ত থাকে ঘ) উপরের সবগুলোই সঠিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

রমযান মাস এলেই ইবাদাতের কথা বলে মাহতাব অফিস কামাই করেন, অফিসে কম সময় উপস্থিত থাকেন। ইমাম সাহেব বললেন, এতে তো আপনার ইবাদাত হচ্ছে না। অফিসে উপস্থিত থাকা আপনার কর্তব্য। আল্লাহকে খুশি করার জন্য আপনি যদি এ কর্তব্য অধিকতর নিষ্ঠার সাথে পালন করেন, তাহলে সেটা ইবাদাত বলে গণ্য হবে। কাজেই ইবাদাতের নামে কর্তব্যে ফাঁকি দেয়া ঠিক না।

ক) কর্তব্যপরায়ণতা কাকে বলে?

খ) মাহতাব সাহেবের কাজ ইবাদাত বলে গণ্য হবে কী?

গ) একজন মুসলমানের সকল কাজ কীভাবে ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) ব্যক্তি ও সমাজজীবনে কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. ঘ,

পাঠ- ১০ : হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- হালালের পরিচয় বলতে পারবেন
- হালাল উপার্জনের উপকারিতা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	হালাল, হালাল উপার্জন, জান্নাত

পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তাআলা তার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকার ও ভোগের জন্যে। তবে মানুষ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়- তার ভোগ সম্ভোগের মধ্যে যেনো সীমা লংঘিত না হয়- তা নিশ্চিত করতে আল্লাহ তাআলা কিছু জিনিসকে হালাল করেছেন আর কিছু করেছেন হারাম। মানুষের জীবনযাপনে এই নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

'হালাল' আরবি পরিভাষা। এর আভিধানিক অর্থ হলো বৈধ বা সিদ্ধ। আইনানুগ বা অনুমোদিত বিষয়কেও হালাল বলা হয়। এছাড়াও সঙ্গত, যথার্থ, পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য অর্থেও এর ব্যবহার রয়েছে।

ইসলামি শরিয়াতের পরিভাষায়, যে সকল বিষয় বৈধ হওয়া কুরআন-হাদিস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়– তাকে হালাল বলা হয়। কেউ কেউ অবশ্য এভাবে বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে– "কুরআন ও হাদিসে যে সকল কাজের অনুমতি রয়েছে এবং যে সম্বন্ধে কোন নিষেধবাণী নেই তাকে হালাল বা বৈধ বলে।"

হালাল উপার্জনের উপকারিতা ও গুরুত্ব

হালাল উপার্জন হলো বৈধ উপার্জন। আল্লাহ ও রাসূল (স.) নির্দেশিত ও অনুমোদিত পন্থায়, কুরআন-সুন্নাহ সম্মতভাবে যে উপার্জন করা হয়, তাকে হালাল উপার্জন বলে। এর অনেক উপকারিতা রয়েছে যেমন–

হালাল উপার্জন মানুষের পার্থিব ও পরকালীন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি ও কল্যাণের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেন–

كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

"তোমরা উত্তম ও পবিত্র বস্তুসমূহ খাও, যে রিযক তোমাদেরকে আমি দিয়েছি তা থেকে।" (সূরা বাকারা ২:৫৭)

মহানবি (স.) বলেন, "হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা ফরযের পরে আরেকটি ফরয।" (বাইহাকি)

কাজেই মুমিন হতে হলে হালাল উপার্জন করতে হবে। ইসলাম অলসতা ও কর্মবিমুখতা পছন্দ করে না। মহানবি (স.) বলেন, "ফজরের সালাতের পর রুযীর সন্ধান না করে ঘুমাবে না।" এ জন্যে হালাল উপার্জনের চেতনা ব্যক্তিকে কাজ করার উৎসাহ দেয়। হালাল উপার্জনে কায়িক বা দৈহিক শ্রম ব্যয় হয়। হাদিসে এসেছে– "দু হাতের উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কোনো দিন খায় নি।" (সহিহ্ বুখারি)

হালাল উপার্জনের বাধ্যবাধকতা ব্যবসা বাণিজ্য, পশু পালন, হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপণ, বিভিন্ন ধরনের নার্সারি, কুটির শিল্প প্রভৃতি উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার প্রেরণা দেয়। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি মানুষের চিরকাঙ্ক্ষিত বিষয়। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি আত্মিক শান্তিলাভ করে।

সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ইবাদত একমাত্র হালাল উপার্জনের মাধ্যমে সম্পন্ন হলেই কবুলযোগ্য হয়।

রাসূলুল্লাহ (স.)বলেছেন, "যে ব্যক্তি হালাল রোজগার দ্বারা তার পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টায় থাকে সে আল্লাহর পথের মুজাহিদের মতো।" (সুনানে ইবনে মাযাহ্)

হালাল উপার্জন করার স্বার্থে ব্যক্তি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চোরাকারবারি, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ, সুদ, ঘুষ, জুয়া ইত্যাদি ছেড়ে দিবে। নিষ্ঠার সাথে নিজের কাজ করবে। ফলে ব্যক্তি উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় উন্নয়ন সম্পন্ন হবে।

হালাল উপার্জন পৃথিবীতে ব্যক্তির মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মানুষ তাকে সম্মান ও সমীহ করে। আখিরাতেও সে বিশেষভাবে সম্মানিত হয়ে থাকে।
হালাল উপার্জন করলে আল্লাহ খুশি হন। রাসূলুল্লাহ (স.)বলেন, "হালাল উপর্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়তম।"

সারসংক্ষেপ

হালাল উপার্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত। এর মাধ্যমে ব্যক্তির অন্যান্য ইবাদাত কবুলযোগ্য হয়। এর ভিত্তিতে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভ করে। মুমিনের জন্যে হালাল উপার্জন করা তাই একটি ফরয কর্তব্য।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ হালাল উপার্জন ও হারাম উপার্জনের একটি তালিকা তৈরী করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। হালাল অর্থ কী?
ক) পবিত্র ও সুন্দর
খ) আনন্দ ও ভালোবাসা
গ) বৈধ বা সিদ্ধ
ঘ) সদাচারণ ও সহমর্মিতা

২। ফরযের পর ফরয কাজ কোনটি?
ক) জ্ঞান অর্জন করা
খ) ইহসান করা
গ) হালাল উপার্জন করা
ঘ) মানবসেবা করা

৩। কোন খাবার সবচেয়ে উত্তম?
ক) সাদাকার খাবার
খ) ঋণের খাবার
গ) মাতাপিতার খাবার
ঘ) নিজের হাতে উপার্জিত খাবার

৪। হালাল উপার্জনকারী কার বন্ধু?
ক) আল্লাহর
খ) মুমিনের
গ) সুলতানের
ঘ) শয়তানের

সৃজনশীল প্রশ্ন

হাসান বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর অনেক জায়গায় চাকরির চেষ্টা করে। কিন্তু চাকরি পায় না। তার কয়েকজন বন্ধু তাকে বলে এমনিতে যখন তোমার চাকরি হচ্ছে না, তখন তুমি অন্য পন্থা অবলম্বন কর। কিছু ঘুষ দিয়ে হলেও চাকরি পাওয়ার চেষ্টা কর। হাসান চাকরির চেষ্টা বাদ দিয়ে কাঁচামালের ব্যবসায় শুরু করে। কারণ সে জানে, উপার্জন হালাল হওয়া আবশ্যক। ঘুষ দিয়ে চাকরি নিলে উপার্জন হালাল হয় না।

ক) হালাল উপার্জন কাকে বলে?
খ) ঘুষ দিয়ে চাকরি নিলে সে চাকরির উপার্জন হালাল না হওয়ার কারণ কী?
গ) হাসানের কাঁচামালের ব্যবসায় করা কি সমর্থনযোগ্য? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।
ঘ) হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা কর।

উত্তরমালা: ১. গ, ২. গ, ৩. ঘ, ৪. ক,

পাঠ- ১১ : হারাম উপার্জনের কুফল ও পরিণাম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- হারামের পরিচয় বলতে পারবেন
- হারাম উপার্জনের কুফল বা ক্ষতি বর্ণনা করতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	হারাম, হারাম উপার্জন, জাহান্নাম।

পরিচয়

হারাম আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো অবৈধ বা নিষিদ্ধ। অর্থগত দিক থেকে শব্দটি সরাসরি 'হালাল' শব্দের বিপরীত। আইনবিরুদ্ধ, অসঙ্গত, অযথার্থ, অপবিত্র প্রভৃতি অর্থেও এর ব্যবহার রয়েছে।

ইসলামি শরিয়াতের পরিভাষায় , যে সকল বিষয় কুরআন- হাদিস দ্বারা পরিষ্কারভাবে অবৈধ প্রমাণিত হয়, তাকে হারাম বলে। সুদ, ঘুষ, মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, চুরি করা, কারো অধিকার নষ্ট করা প্রভৃতি হারামের উদাহরণ।

হারাম উপার্জনের অপকারিতা বা কুফল বা পরিণাম

হারাম পদ্ধতিতে জীবিকা অন্বেষণ হলো হারাম বা অবৈধ উপার্জন। এখানে এর কুফল বর্ণনা করা হলো মহানবি (স.) বলেন, "লোকে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করে এবং দুআ কবুলের আশায় এলোমেলো কেশে ধুলায় ধুসরিত অবস্থায় দু'হাত আসমানের দিকে তুলে বারবার দুআ করে হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!! অথচ তার খাবার হারাম, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম খাদ্যে সে লালিত পালিত হয়েছে। এমন ব্যক্তির দুআ আল্লাহর কাছে কীভাবে কবুল হতে পারে ?" (সহিহ মুসলিম)

হারাম উপার্জন ব্যক্তির পরকালীন জীবনের চিরস্থায়ী ঠিকানা হিসেবে জাহান্নামকে নির্দিষ্ট করে দেয়। মহানবি (স.)বলেন– "যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্যে জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান।" (মুসনাদে আহমাদ)

হারাম উপার্জনে নিছক প্রবৃত্তি ও শয়তানের আনুগত্য করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা এবং ভাগ্য নির্ণয়ক শর অপবিত্র ও শয়তানের কাজ। অতএব, তোমরা তা থেকে দূরে থাক, তাহলেই মুক্তি পাবে।" (সূরা মায়িদা ৫: ৯০)

হারাম উপার্জন ও ভক্ষণ ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির জন্যে চরম ক্ষতিকর। এর ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভবপর হয়ে পড়ে। সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, প্রতারণা প্রভৃতি হারাম উপার্জন পদ্ধতির ফলে জীবনের প্রতিটি পর্যায় বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হারাম উপার্জন অন্যায় পথে সম্পাদিত হয় বলে ব্যক্তি তা নিয়ে সর্বক্ষণ দুঃশ্চিন্তায় ভোগে। ফলে তার মানসিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়।

হারাম উপার্জনের ফলে অপচয়-অপব্যয় কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সাধারণত মানুষকে ঠকিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করে কিংবা চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই ইত্যাদির মাধ্যমে হারাম উপার্জন করা হয়। এর ফলে বঞ্চিত লোকেরা হারাম উপার্জনকারীদের অভিশাপ দেয়। আল্লাহর নিকটও তারা অভিশপ্ত হয়।

হালাল উপার্জনে যেমন কল্যাণ ও মুক্তি নিশ্চিত হয় তেমনি হারাম উপার্জন ধ্বংস করে আমল, নিশ্চিহ্ন করে শান্তি ও মুক্তি। কাজেই মুমিন ব্যক্তি সর্বোতভাবে হারাম পরিত্যাগ করে। সব সময় হালাল জীবিকা গ্রহণের চেষ্টা করে।

সারসংক্ষেপ

হারাম উপার্জন ইমান বিরোধী কাজ। কোনো মুমিন এ কাজ করতে পারে না। কারণ এতে দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়ানক ক্ষতির শিকার হতে হয়। মুসলমানগণ তাই যে কোনো মূল্যে হারাম উপার্জন থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখেন।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	হারাম উপার্জনের পরিণতি কী কী তা শিক্ষার্থীগণ একে অপরের সাথে অলোচনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। হারাম অর্থ কী?

ক) অবৈধ ও নিষিদ্ধ
খ) মুবাহ
গ) আবশ্যক
ঘ) বৈধ

২। হারাম থেকে তৈরি গোশতের উপযুক্ত স্থান কোনটি?

ক) জেলখানা
খ) জাহান্নাম
গ) জান্নাতুল মাওয়া
ঘ) আলমে বারযাখ

৩। কী বা কে নতুন নতুন পাপের পথ খুলে দেয়?

ক) হারাম উপার্জন
খ) শারীরিক দূর্বলতা
গ) প্রতিবেশির প্রতি বিতৃষ্ণা
ঘ) আত্মহত্যা

সৃজনশীল প্রশ্ন

আশরাফ বড় ফল ব্যবসায়ী। তবে ফলে তিনি ক্ষতিকর প্রিজারভেটিভ দিয়ে থাকেন। বিষয়টি একজন আলিমকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, আশরাফ সাহেবের উপার্জন হালাল নয়। কারণ তিনি মানুষের জন্য ক্ষতিকর উপায় ব্যবহার করেন। আর আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য ক্ষতিকর কিছু ব্যবহার হালাল রাখেননি।

ক) হারাম উপার্জন কাকে বলে?

খ) আশরাফ সাহেবের জীবিকা উপার্জন হালাল নয় কেনো?

গ) কীভাবে আশরাফ সাহেবের জীবিকা উপার্জন হালাল হতে পারে? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে লিখুন।

ঘ) হারাম উপার্জনের কুফল বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. ক,

পাঠ- ১২ : দেশপ্রেম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- দেশপ্রেমের পরিচয় বলতে পারবেন
- দেশপ্রেমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- দেশপ্রেমের উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	দেশপ্রেম, দেশের মানুষ, দেশের স্বাধীনতা।

স্বদেশ অর্থ নিজের দেশ। যে দেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, বড় হয়, যে দেশের আলো–বাতাস–ফল–ফসল তাকে বাঁচিয়ে রাখে, খাদ্য পুষ্টি জোগায় এবং যে দেশে সে স্থায়ীভাবে বসবাস করে সে দেশকে তার স্বদেশ বা নিজের দেশ বলে। নিজ দেশের জন্য মানুষের সহজাত ও স্বভাবজাত ভালোবাসা রয়েছে। এ ভালোবাসা মানুষের মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়। বড় হয়ে কাজের জন্য বা অন্য কোন কারণে নিজের দেশ ছেড়ে গেলেও এ ভালোবাসা কমে না। নিজ দেশের প্রতি মানুষের অন্তরের এই টান, স্বতঃস্ফূর্ত মায়া–মমতা, প্রগাঢ় ভালোবাসা ও আকর্ষণকেই স্বদেশ প্রেম বলে।

দেশ মানুষের শৈশব–কৈশোর–যৌবন ও বার্ধক্যের কর্মভূমি। সকল স্মৃতি, দুঃখ–বেদনা ও আনন্দের স্থান। নিজ দেশের মাটি, আলো, বাতাস, আবহাওয়া, আকাশ, ঋতু বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের মনকে আনন্দিত ও বিমুগ্ধ করে রাখে।

দেশপ্রেমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা বা দেশকে ভালোবাসা একটি মানবিক গুণ। পৃথিবীর সকল মনীষী–সাধক–বিজ্ঞানী, আউলিয়া এবং নবি–রাসূলগণ দেশের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) অত্যন্ত দেশপ্রেমিক ছিলেন। মক্কায় কাফিরদের নির্মম নির্যাতনের কারণে ইসলাম প্রচারের স্বার্থে আল্লাহর নির্দেশে তিনি দেশত্যাগ করেন। যাওয়ার সময় বারবার মক্কার দিকে, কা'বার দিকে তাকিয়ে আফসোস করেন আর বলেন – 'হে আমার দেশ! তুমি কত সুন্দর। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার নিজ গোত্রের লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।'

প্রকৃত মুমিন নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে। দেশপ্রেম ইমানের দাবি। কেননা, নিজের দেশ না হলে, দেশ স্বাধীন না থাকলে অনেক ইবাদাত এবং আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করা যায় না। সালাত, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ইবাদাত সুন্দরভাবে করা যায় না। মানুষের নীতি–নৈতিকতা শোভন ও সুন্দর হয় না। পরিণতিতে ইমানের উপর টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। মনীষীগণ এ জন্যই বলেছেন – حُب الوَطَن مِنَ الايْمَان 'স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।' (মাওসুআতুররদ্দি আলাল মাযাহিবিল ফিকরিইয়াতিল মুআসিরাহ, মাকতাবাতুশ শামিলা)

দেশের স্বাধীনতা ইবাদাতের জন্য, স্বাধীনভাবে ইসলামের বিধি–বিধান মেনে চলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য দেশের স্বাধীনতা রক্ষার কাজও ইবাদত। হাদিসে আছে – 'যারা দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাহারায় বিনিদ্র রাত কাটায় তাদের জন্য জান্নাত।'

দেশকে ভালোবাসলে ব্যক্তির নিজের উন্নতি ঘটে। দেশের ভালোবাসা তাকে দায়িত্বশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মমুখী করে তোলে। ফলে ব্যক্তির উন্নতির সাথে সাথে দেশও উন্নত হয়। দেশপ্রেমিক মানুষ দেশের ক্ষতি করে না। দেশের সম্পদ নষ্ট করে না। দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করে না। দেশপ্রেম তাই একটি অত্যন্ত মহৎ মানবিক গুণ। যারা দেশকে ভালোবাসে না তারা চরম অকৃতজ্ঞ। দেশের উপকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করার পর দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি মমতা পোষণ না করা কেবল জঘন্য চরিত্রের লোকদের পক্ষেই সম্ভব। যারা দেশের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে না তারা দেশের শত্রু, দেশের মানুষের শত্রু। দেশ ও জনগণের স্বার্থরক্ষা এবং ব্যক্তির উন্নতির জন্য তাই দেশপ্রেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের উপায়

১. দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ ও প্রদর্শনের সবচেয়ে ভালো উপায় হল অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করা।
২. দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার করা। প্রয়োজনে জীবন–সম্পদ উৎসর্গ করা।
৩. জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখা।
৪. দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। তাদের কল্যাণে কাজ করা।
৫. দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ না করা। চোরাচালানি বন্ধ করা ও কর্তব্যে অবহেলা না করা, দ্রব্যে ভেজাল না দেয়া ও জাতীয় সম্পদ নষ্ট না করা।
৬. দেশের মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি করায় ভূমিকা রাখা।
৭. দেশের মানুষকে শিক্ষিত ও দক্ষ করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৮. নিজে দুর্নীতি না করা এবং কাউকে দুর্নীতি করতে না দেয়া।
৯. নিজে সন্ত্রাসী কোন কাজ না করা এবং সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না দেয়া।
১০. দেশ ও জনগণের স্বার্থে নিজের সামর্থ্য নিবেদন করা।

আমরাও আমাদের প্রিয় স্বদেশ বাংলাদেশকে ভালোবাসবো। দেশের ও দেশের মানুষের কল্যাণে অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবো। দেশের ও দেশের মানুষের স্বার্থবিরোধী কোন কাজ করবো না।

সারসংক্ষেপ

দেশপ্রেম মূলত দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। এটি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা পরিপন্থী নয়। কারণ হাদিসে সুস্পষ্টভাবে রয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। সুতরাং দেশের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ও দেশের জন্য অবদান রাখা হলো দেশপ্রেম।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	দেশপ্রেম কী কী কাজে প্রদর্শিত হয়, একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণি কক্ষে প্রদর্শন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। দেশের প্রতি মানুষের ভালোবাসার প্রকৃতি কী?
ক) জবরদস্তিমূলক
খ) সহজাত ও স্বভাবজাত
গ) নৈর্বাচনিক
ঘ) প্রতারণামুক্ত

২। "আমার নিজ গোত্রের লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না" নিজের দেশকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো কে বলেছেন??
ক) হযরত আবু বকর (রা)
খ) হযরত ইবরাহীম (আ)
গ) হযরত মুহাম্মদ (স.)
ঘ) হযরত মূসা (আ)

৩। যারা দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাহারায় বিনিদ্র রাত কাটায় তাদের প্রতিদান কী?
ক) রাষ্ট্রীয় পদক
খ) সম্মানজনক উপাধি
গ) জান্নাত
ঘ) ইহসান

সৃজনশীল প্রশ্ন

মুর্শিদ বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশের সদস্য। সীমান্তে এক চোরাকারবারি তাকে কয়েক লক্ষ টাকা ঘুষ দেয়। মুর্শিদ ঘুষের টাকা ফেরত দিয়ে চোরাকারবারি ও তার চোরাইমাল আটক করে। সে ঘোষণা করে, আমি আমার দেশকে ভালোবাসি। দেশের সাথে আমি বেইমানি করতে পারি না।

ক) দেশপ্রেম কাকে বলে?

খ) চোরাকারবারে দেশের ক্ষতি হয় কেনো?

গ) মুর্শিদের মতো বিভিন্ন বিভাগের কর্মজীবীরা কীভাবে দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারেন।

ঘ) দেশের প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. গ,

পাঠ- ১৩ : ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন
- ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা বর্ণনা করতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	আইয়ামে জাহিলিয়া, ক্রীতদাসী, সম্মান, অধিকার, মায়ের পদতলে জান্নাত।

ইসলামে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্মান ও অধিকারেও কোন পার্থক্য করা হয় নি।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর মর্যাদা ও অধিকার কেমন ছিল,

ইসলাম পূর্ব যুগে আরব ও সমগ্র বিশ্বে নারী অত্যন্ত অপমান ও অসম্মানের জীবন যাপন করত।

জাহেলি যুগে আরবে নারী জাতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সেখানে বিয়ের ও বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো নিয়ম কানুন ছিল না। ওয়ারিশসূত্রে তারা কোন সম্পদ পেতো না। ক্রীতদাসী হিসেবে তারা প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি হত। আরবের লোকেরা কন্যা শিশুর জন্মকে লজ্জাকর বিষয় মনে করতো। অনেকেই কন্যা শিশু জন্ম নেয়ার পর তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলত। নারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করা তাদের কাছে চরম অশান্তি ও লাঞ্ছনার বিষয় বলে গণ্য হত।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

ইসলাম অধিকার ও মর্যাদায় নারী–পুরুষে কোন পার্থক্য করে নি। দুনিয়ার প্রথম পুরুষ আদম ও প্রথম নারী হাওয়া (আ) এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নর–নারীর সমান বিস্তার ঘটিয়েছেন। বলেছেন –

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে।' (সূরা হুজুরাত ৪৯ : ১৩)

নারী পুরুষের মর্যাদায় সমতা ঘোষণা করে বলেছেন –

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

'মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ ভালো কাজ করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করবো।' (সূরা নাহল ১৬ : ৯৭)

ইসলাম পুত্র সন্তানের চেয়ে কখনো কন্যা সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.)উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, 'প্রথম সন্তান যাদের মেয়ে তারা হলো ভাগ্যবান মাতাপিতা।' তিনি বলেছেন – 'কন্যা সন্তানদের ঘৃণা করো না। কেননা আমি স্বয়ং কন্যা সন্তানের পিতা।'

স্ত্রী হিসেবে নারীকে ইসলাম স্বামীর সমান মর্যাদা দিয়েছে। স্বামীকে স্ত্রীর মোহরানা আদায়, ব্যয়ভার বহন, খাদ্য–বস্ত্র–বাসস্থানের ব্যবস্থাকরণ, সদাচরণ ও মর্যাদা প্রদানের আদেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন – 'আর স্বামীদের যেমন অধিকার আছে স্ত্রীর ওপর, তেমন অধিকার আছে স্ত্রীদেরও স্বামীর উপর। (সূরা বাকারা ২ : ২২৮)

ইসলাম মা হিসেবে নারীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের সম্মান দিয়েছে। মায়ের জন্য সর্বোচ্চ অধিকার ও মর্যাদা নির্দেশ করে প্রতিটি মানবসন্তানের কাছে নারীকে পরম সম্মানিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। পৃথিবীর সকল মানুষের জান্নাত রেখে দিয়েছে মায়ের পায়ের নিচে। রাসূলুল্লাহ (স.)বলেছেন– اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الاُمَّهَاتِ 'মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত।' (আল-জামিউস সগির)

একমাত্র ইসলামই পিতা ও স্বামীসহ সকল নিকটাত্মীয়ের সম্পদে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'মাতাপিতা ও আত্মীয়–স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং মাতাপিতা ও আত্মীয়–স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে নারীরও অংশ আছে, তা কম হোক বা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ। (সূরা নিসা : ৭)

ইসলাম নারীকে স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের অধিকার দিয়েছে। কুরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে –

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

"পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।" (সূরা নিসা ৪ : ৩২)।

কাজেই ইসলামের পর্দা মেনে নারীকে ব্যবসায়–বাণিজ্য, চাকুরি ইত্যাদি করার অধিকার ইসলাম দিয়েছে।

নারীকে জ্ঞানের ভুবনে নিয়ে আসার একক কৃতিত্ব ইসলামের। ইসলামে নারীর জন্যও জ্ঞানার্জনকে ফরয করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.)বলেছেন – 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য ফরয।'

ইসলাম পুরুষের মতোই নারীকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে। পছন্দমত বিয়ে করা, প্রয়োজনে তালাক দেয়া, পরিবারে পরামর্শ দেয়া এবং পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে ক্ষমতা দিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কেবল দায়িত্ব পালনের ধরণ আলাদা করে দেয়া হয়েছে। আল কুরআনের 'সূরা নিসা' নামক সূরায় এবং আরো বহু আয়াতে নারী অধিকার ও মর্যাদার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

ইসলাম নারী জাতিকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছে। সুতরাং জীবনের সকলক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই প্রকৃত নারী মুক্তি তথা নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অন্য কোনো পথে নয়।

সারসংক্ষেপ

মানুষ জাতির দুটি অংশের একটি হলো নারী জাতি। ইসলাম নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা এবং আবশ্যিক অধিকার প্রদান করেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছে। ইসলামের সঠিক অনুশীলন এবং যথাযথ চর্চার মাধ্যমে নারী সত্যিকারের মুক্তি ও প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ, "ইসলামে নারী অধীকার" নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। কন্যা শিশু জন্মানোর পর প্রাক–ইসলাম আরবের লোকেরা কী করতো?

ক) আনন্দ ও ভালোবাসায় তাদের লালন–পালন করতো
খ) ধাত্রীগৃহে প্রেরণ করতো
গ) জীবন্ত কবর দিত
ঘ) অনাদরে–অবহেলায় লালন–পালন করতো

২। হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক .....হতে?
ক) প্রকৃতি হতে
খ) মাটি থেকে
গ) নারী হতে
ঘ) মাতা হতে

৩। প্রথম সন্তান যাদের মেয়ে, তারা হলো–
ক) হতভাগ্য মাতাপিতা
খ) ভাগ্যবান মাতাপিতা
গ) সৎ ও নিষ্ঠাবান মাতাপিতা
ঘ) জাতির ভবিষ্যৎ

৪। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য এবং নারী যা অর্জন করে তা –
ক) তার স্বামীর প্রাপ্য
খ) তার পিতার প্রাপ্য
গ) তার সন্তানের প্রাপ্য
ঘ) তার প্রাপ্য

সৃজনশীল প্রশ্ন

আসমা মাটি কাটার কাজ করে। শাহানা কারখানার শ্রমিক। সাবিহা করপোরেট কর্মকর্তা। দিন–রাত অবিশ্রান্ত কাজের চাপে তারা খুবই ব্যস্ত। সংসার ও সন্তানকে সময় দেয়ার সুযোগ নেই। পুরুষের সাথে সবসময় পাল্লা দিয়ে সামনে যাওয়ার চাপ। খতীব সাহেব বললেন, নারীকে সন্তান ধারণ ও লালন পালনের সুকঠিন কাজ করতে হয়। এমতাবস্থায় একজন নারী কতটুকু কর্মব্যস্ত থাকতে পারে তা বিবেচনায় আনতে হবে। সাধ্যের বাহিরে কাজ চাপিয়ে দিলে নারীর উপর যুলুম করা হয়।

ক) ইসলামপূর্ব আরবে নারীরা কেমন মর্যাদার অধিকারী ছিল?
খ) ঘরে–বাইরে সমান কাজের চাপ নারীর প্রতি যুলম কেন?
গ) কীভাবে নারীকে প্রকৃত মর্যাদা ও যথাযোগ্য অধিকার প্রদান করা সম্ভব?
ঘ) ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে বিবরণ দিন।

উত্তরমালাঃ **১. গ,** **২. গ,** **৩. খ,** **৪. ঘ,**

পাঠ- ১৪ : শিশুদের অধিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিশুদের অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	শিশু, মাতৃদুগ্ধ, নিরাপত্তা, লালন–পালন।

শিশুরা মানব জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশুই আগামী দিন দেশ, জাতি, সমাজ ও পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। মানুষের মধ্যে যে অমিত সম্ভাবনা থাকার কথা বলা হয়, তা মূলত শিশুর যথাযথ পরিচর্যা ও যত্নের ওপরই নির্ভর করে। শিশুর বিকাশে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব না হলে মানবসভ্যতা বিকশিত হতে পারে না। ইসলাম তাই শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য শিশু একান্তভাবে যাদের ওপর নির্ভর করে, সেই মাতা-পিতার প্রতি বিশেষ কিছু দায়িত্ব প্রদান করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট তৈরির নির্দেশনা দিয়েছে।

বৈধ সম্পর্কে জন্মগ্রহণের অধিকার

ইসলামে শিশুর প্রথম অধিকার হলো, তার জন্ম হতে হবে বৈধ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে। অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে তার জন্ম কাম্য নয়।

পরিচর্যা ও পালিত হওয়ার অধিকার

শিশুর অধিকার রয়েছে মাতা-পিতার হৃদয়নিংড়ানো ভালোবাসা, যত্ন, আদর ও মায়া-মমতাসহ পরিচর্যা পাওয়ার এবং লালিত-পালিত হওয়ার।

নিরাপত্তা লাভের অধিকার

মানবশিশু সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে থাকে। তাই মাতা-পিতা তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। কোনো কারণেই নিজেরা যেমন সন্তানের কোনো রকম ক্ষতিসাধন করবেন না, তেমনি অন্যকেও ক্ষতি করতে দেবেন না।

ধর্মীয় শিক্ষা লাভের অধিকার

ধর্মীয় বিশ্বাস আকিদা আমল সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়ার এবং শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করায় অভ্যস্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে শিশুর। হযরত রাসূল (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত বা ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর মাতা পিতাই তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজকে পরিণত করে।" (সুনানে তিরমিযি)

বৈষয়িক ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের অধিকার

শিশুর অধিকার রয়েছে বৈষয়িক ও ব্যবহারিক বিষয়ের শিক্ষা লাভ করার। সে জন্য মাতা-পিতা হাতে-কলমে জীবন যাপনের জন্য জরুরি এ বিষয়গুলো শিখিয়ে দেবেন।

সৎ উপদেশ পাওয়ার অধিকার

ভালো উপদেশ মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এ কারণে শিশুর অধিকার রয়েছে মাতা-পিতার সৎ উপদেশ লাভ করার।

মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকার

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পর শিশুর প্রথম এবং প্রধান অধিকার হলো মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকার। পৃথিবীতে শিশুর আসার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তার জন্য মায়ের স্তনে প্রয়োজনীয় জীবিকার সংস্থান করেন। এ থেকে কোনো কারণেই শিশুকে বঞ্চিত করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

"মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পুরো দু'টি বছর দুধ পান করাবেন।" (সূরা বাকারা ২: ২৩৩)

পুত্র ও কন্যা শিশুর মধ্যে পার্থক্য না করা

ইসলামে পুত্র ও কন্যা শিশুর মধ্যে পার্থক্য করে না। বরং কন্যা শিশুকে পুত্র শিশুর চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছে।

দুঃস্থ-ইয়াতিম শিশুর বিশেষ অধিকার

যে শিশুর মাতা-পিতা নেই, আর্থিক বা সামাজিকভাবে দুঃস্থ, নানাবিধ অভাব-অভিযোগ ও অসুবিধার মধ্যে জীবন অতিবাহিত হয়, ইসলাম এমন শিশুর জন্যও বিশেষ অধিকার ঘোষণা করেছে। তাদের সার্বিক সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সমাজের অবশিষ্ট সকলের অবশ্য কর্তব্য। এ ছাড়াও শিশুদের আরো অনেক অধিকার রয়েছে। যেমন-

- জন্মের পর সাথে সাথে কানে আযান শুনানো
- উত্তম নাম রাখা,
- আকিকাহ করা ও মাতা মুণ্ডানো
- খাতনা করানো
- ইবাদতের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া
- শিশুদের শ্রম নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ

ইসলাম শিশুকে কেবল শিশু হিসেবে বিবেচনা করেনি। বরং আগামীর নেতা, কর্মী, শিক্ষক, যোদ্ধা, সমাজসেবক ইত্যাদি হিসেবেই বিবেচনা করে। শিশুর মধ্যে বিকশিত করতে চেয়েছে আগামীর অমিত সম্ভাবনা। এ কারণেই সর্বোতভাবে তাকে আগামীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। ইসলামের এসব নীতি-দর্শন, আদর্শ ও অধিকার যদি কোনো শিশুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে যথার্থই তার কল্যাণ সাধিত হবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ, "ইসলাম ও শিশু অধিকার" বিষয়ে একটি এ্যসাইনমেন্ট উপস্থাপন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। প্রত্যেক মানব শিশু কোন ধর্মের অনুসারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে?

ক) মানবধর্ম খ) প্রাকৃতিক ধর্ম
গ) ইসলাম ধর্ম ঘ) খ্রিস্টধর্ম

২। মানবশিশুর শ্রেষ্ঠতম অধিকার কোনটি?

ক) মাতৃদুগ্ধপান খ) ধাত্রীগৃহে লালন–পালন
গ) সুন্দর ও আরামদায়ক ঘর ঘ) নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা

সৃজনশীল প্রশ্ন

মি. নরম্যান বাংলাদেশে জাতিসংঘের শিশু অধিকার ব্যুরোর কান্ট্রি ডিরেক্টর। একবার তিনি মাদরাসার একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিসের সাথে মতবিনিময় করেন এবং ইসলামে শিশু অধিকার সম্পর্কে জানতে চান। মুহাদ্দিস সাহেব কুরআন–হাদিসের আলোকে বিষয়টি অবহিত করলে মি. নরম্যান বিস্মিত হয়ে বলেন, জাতিসংঘের সকল সনদের চেয়ে ইসলামেই তো শিশুর সর্বাধিক সুরক্ষা দেয়া হয়েছে!

ক) শিশু কারা?
খ) শিশুদের প্রতি সবচেয়ে বেশি যত্ন নেয়া আবশ্যক কেনো?
গ) ইসলামের আলোকে কীভাবে বাংলাদেশের শিশুদের বিকাশ ও অধিকার নিশ্চিত করা যায়?
ঘ) আপনি কি মি. নরম্যানের বক্তব্য সমর্থন করেন? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি–প্রমাণ পেশ করুন।

উত্তরমালাঃ **১. গ,** **২. ক,**

পাঠ- ১৫ : প্রতিবন্ধীদের অধিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- প্রতিবন্ধীর পরিচয় বলতে পারবেন
- ইসলামে প্রতিবন্ধীর অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

Key Words/মুখ্যশব্দ	প্রতিবন্ধী, মানবিকতা, মূল্যবোধ

অর্থগতভাবে এমন ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বলে, যে জন্মগতভাবে বা রোগের কারণে কিংবা অপচিকিৎসার শিকার হয়ে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। যে বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার জন্য ব্যক্তি স্থায়ীভাবে কর্মে অক্ষম ও স্বাভাবিক জীবন-যাপনে অপরাগ। তাই দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, দৃষ্টি, শ্রবণ, বাক ও যোগাযোগে বাধা বা সীমাবদ্ধতার কারণে যখন ব্যক্তির মেধার বিকাশ, কাম্য সম্ভাবনা ও যোগ্যতা বাধাগ্রস্ত হয় এবং ব্যক্তির নিজের, পরিবারের ও সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় তখন ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ইসলামি শরিয়া প্রতিবন্ধীদের জন্য সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিক মানবিক ও মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যেমন,

মানবীয় মর্যাদা লাভের অধিকার : আল্লাহ তা'আলা একজন সাধারণ সুস্থ মানুষকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, যে উৎস থেকে সৃষ্টি করেছেন একজন প্রতিবন্ধীকে সেই একই উৎস থেকে অভিন্ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ হিসেবে একজন প্রতিবন্ধী সাধারণ সুস্থ মানুষের মতোই অধিকার ও মর্যাদা লাভ করবেন।

অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের অধিকার : ইসলামের অসংখ্য কল্যাণময় ব্যয়ের খাতের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যয় করা একটি অন্যতম শীর্ষ খাত। এটি তাদের প্রতি করুণা নয়। বরং আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের অধিকার : প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও কারণ অনুসারে তাদেরকে যতটুকু সম্ভব স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা আবশ্যক। এ জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ইসলাম সবার জন্য জ্ঞানার্জন ফরযের যে বিধান করেছেন প্রতিবন্ধীরা তা থেকে বঞ্চিত হবে না। তারা যেহেতু নিজ উদ্যোগে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিতে সক্ষম নয়, এ কারণে পরিবার ও সমাজকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে।

পরিবার গঠনের অধিকার : প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি স্বামী বা স্ত্রীর মানবিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হলে তাকে পরিবার গঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। বরং স্বামী বা স্ত্রীর অধিকার পূরণ করে যদি প্রতিবন্ধীদের পরিবার গঠনের সুযোগ করে দেয়া যায় তাহলে তারা অনেকাংশে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। নবিযুগে অন্ধ-সাহাবি উম্মে মাকতুমের বিবাহ করা থেকে বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়।

চিকিৎসা সেবা লাভের অধিকার : রাসূলুল্লাহ (স.) একজন মুমিনের জন্য অন্য মুমিনের যে ৬টি বিশেষ কর্তব্যের কথা ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো অসুস্থ অবস্থায় সেবা করা। হাদিসে কুদসিতে এমন ঘোষণাও রয়েছে, হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বলবেন, তিনি রোগে অসুস্থ ছিলেন মানুষ তার সেবা করেনি। মানুষ বলবে কীভাবে আল্লাহর সেবা করা সম্ভব ছিল? আল্লাহ বলবেন, অসুস্থ লোককে সেবা করলেই আল্লাহর সেবা করা হতো। প্রতিবন্ধীরা এক ধরনের স্থায়ী অসুস্থতায় ভোগেন। তাই তাদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

পরিবার ও সমাজে বিশেষ তত্ত্বাবধান লাভের অধিকার : প্রতিবন্ধীদের উপহাস করা যাবে না। বোঝা মনে করা যাবে না। বরং পরিবারে ও সমাজে তাদেরকে বিশেষ যত্ন ও তত্ত্বাবধান করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের প্রতিবন্ধিতার জন্য সব সময় দুঃশ্চিন্তা ও মনোকষ্টে না ভোগেন। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হারাম করেছেন।

মানসিক ও দৈহিক ঝুঁকিতে বিশেষ নিরাপত্তা লাভের অধিকার : প্রতিবন্ধীরা সব সময় মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকেন। তাদের এ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে প্রয়োজন বিশেষ যত্ন ও নিরাপত্তা। ইসলাম এ জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যাকাত, সাদাকাতুল ফিতর ও ঐচ্ছিক দানসমূহ ব্যবহারের বিশেষ সুযোগ রেখেছে।

মানবিক ও মৌলিক অধিকার লাভের অধিকার : ইসলামে মানুষের জন্য যে মানবিক অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে, যেমন সুবিচার, সদাচার, সহযোগিতা, জুলুমের প্রতিবাদ, অনাচার থেকে দূরে থাকা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকার এবং খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের মৌলিক অধিকার প্রতিবন্ধী পূর্ণমাত্রায় লাভ করবে। প্রতিবন্ধী বলে তাকে উত্তরাধিকার, মালিকানা ইত্যাদি বিষয় থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে সে যদি মানসিক বা দৈহিক প্রতিবন্ধকতার কারণে বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনায় অক্ষম হয়, তাহলে তার পরিবারের সদস্যরা, সদস্য কেউ না থাকলে নিকটাত্মীয়রা, না থাকলে প্রতিবেশিরা, না থাকলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সমাজপতি বা প্রশাসক তার স্বার্থ সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ইসলাম ইহসানের যে নীতি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে প্রবর্তন করেছে প্রতিবন্ধীরাই এর সবচেয়ে বড় হকদার। তাই মানবিক আবেগ ও ধর্মীয় দায়িত্বানুভূতি নিয়ে প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায় করা সবার অবশ্য কর্তব্য।

সারসংক্ষেপ

প্রতিবন্ধী হিসেবে ইসলাম কাউকে হেয় বা নীচ বা অসম্মান করেনি। বরং সাধারণ মানুষের মতোই তাদেরকে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। তাদেরকে নিয়ে তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করার সুযোগ বন্ধ করেছে। তাদের জন্য সুস্থ্য–স্বাভাবিক লোকদের বিশেষ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করেছে। ধর্মীয় বিধি-বিধানের অসংখ্য স্থানে তাদের জন্য অবকাশ রেখে প্রতিবন্ধীদের যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার বিধি প্রবর্তন করেছে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ, "প্রতিবন্ধী সমাজের বোঝা নয়" শীর্ষক একটি সিম্পুজিয়াম-এর আয়োজন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। প্রতিবন্ধী কে বা কারা?

ক) দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ

খ) আর্থিকভাবে দরিদ্র, দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ ও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন

গ) দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ ও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন

ঘ) মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন

২। ইসলামের হুকুম অনুসারে প্রতিবন্ধীদের সাথে উপহাস করা–

ক) বৈধ

খ) মুবাহ

গ) সুন্নাহ

ঘ) হারাম

সৃজনশীল প্রশ্ন

রেজার ছোটো ভাই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। বাড়ির সবাই ওকে নানাভাবে তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করে। আত্মীয়–স্বজনরা পর্যন্ত খারাপ খারাপ কথা বলে। কেবল রেজার মা এবং রেজা ওকে আগলে রাখে। রেজা সবাইকে বুঝানোর চেষ্টা করে, ওর সাথে ভালো ব্যবহার করা ইসলামের নির্দেশ। যারা এর অন্যথা করে, তারা নিজেদের ক্ষতি করে, আর অসহায় ছোটোভাইটির স্বাভাবিক জীবনকে পুরোপুরি অসম্ভব করে তোলে।

ক) প্রতিবন্ধী কাকে বলে?

খ) প্রতিবন্ধীর সাথে বেশি ভালো ব্যবহার করা আবশ্যক কেনো?

গ) রেজা কীভাবে তার প্রতিবন্ধী ছোটোভাইটির স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিত করতে পারে? বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) ইসলামে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ,